ভয়ংকর প্রতিশোধ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BHAYANKAR PRATISODH

A Juvenile Story by—

Sunil Gangopadhaya

প্রথম প্রকাশ :

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তী

পত্রলেখা

৮৯ নারিকেল ডাঙ্গা মেইন রোড

কলিকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :

শ্রীতপন কর

মুদ্রক :

শ্রীমতী রেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৪

বুলবুল ও মুনমুনকে

প্রীতি-উপহার

ঃ কোন পাতায় কোন গল্প ঃ

ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ

কালো চশমা পরা লোকটি দাঁড়িয়েছিলেন হাজরা রোডের মোড়ে। অনেকেই রোদ্দুরের সময় নানারকম রঙের সান গ্লাস পরে, তাই দীপু প্রথমে কিছু বুঝতে পারে নি। তারপর লোকটির হাতে একটা সাদা রঙের লম্বা লাঠি দেখে দীপু বুঝতে পারলো যে লোকটি অন্ধ।

দীপু বাবার কাছে শুনেছিল যে সারা পৃথিবীতেই অন্ধ লোকেরা রাস্তায় বেরুবার সময় হাতে ঐ রকম ঠিক সাদা রঙের একটা লাঠি রাখে। তাতে অন্ধ লোকদের চিনবার সুবিধে হয়। অনেক সময় অন্য লোকেরা রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে একজন অন্ধ লোককেই ধাক্কা দিয়ে বলে ওঠে, চোখ নেই নাকি? দেখেশুনে হাঁটতে পারো না?

বিকেল পাঁচটা, এই সময় হাজরা রোডে দারুণ ভিড়। অনবরত গাড়ি যাচ্ছে আসছে। দীপুর মনে হলো অন্ধ লোকটি রাস্তা পার হতে পারছেন না বলেই দাঁড়িয়ে আছেন।

সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি রাস্তার ওপারে যাবেন? আমি আপনার হাত ধরে নিয়ে যেতে পারি।

লোকটি খুব বুড়োও নয় আবার যুবকও নয়। মুখে দাড়ি আছে। সেই দাড়ি আর মাথার চুল সামান্য কাঁচা পাকা। লোকটি বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিলেন, দীপুর কথা শুনে চমকে উঠলেন।

দীপু লোকটির হাত ধরে বললো, চলুন, আমি আপনাকে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছি।

লোকটিকে নিয়ে দীপু রাস্তায় নেমে পড়লো। একটা হাত উঁচু করে রইলো যাতে গাড়িগুলি তাদের দেখে থেমে যায়। সত্যিই

অনেক গাড়ি হর্ণ দিতে দিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করতে লাগলো।

রাস্তার ওপারে এসে দীপু বললো, এবার আপনি কোন দিকে যাবেন? ডান দিকে, না বাঁ দিকে? আমি কি আর একটু এগিয়ে দেবো আপনাকে?

লোকটি এবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ দিকে থাকো ভাই? রাস্তার এপারে না ওপারে?

দীপু বললো, রাস্তার ওপারে। আমি বাড়ির জন্য একটা পাউরুটি কিনতে এসেছিলাম।

লোকটি বললেন, তাহলে তুমি এপারে এলে—কেন ভাই?

দীপু বললো, বাঃ এইটুকু এলে কী হয়েছে: আপনি রাস্তা পার হতে পারছিলেন না, সেইজন্য।

লোকটি বললেন, তাহলে এসেছোই যখন, তখন তোমাকে আর একটু আসতে হবে। তুমি আমায় বাড়িতে পৌঁছে দাও।

দীপু একটু কিন্তু কিন্তু করতে লাগলো। মা তাকে বলেছিলেন মোড়ের দোকান থেকে পাউরুটি কিনে আনতে। বেশীক্ষণ তো লাগবার কথা নয়। দীপুর ফিরতে দেরী হলে মা চিন্তা করবেন।

কিন্তু একজন অন্ধ লোক যদি বলে বাড়িতে পৌঁছে দিতে, তাহলে না বলা উচিত না। তাছাড়া দীপুর এখন তের বছর বয়েস হয়ে গেছে, সে তো আর রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না। সে এদিককার সব রাস্তাই চেনে।

অন্ধ লোকটি বললেন, এই যে, কাছেই হাজরা পার্ক এটা তুমি কোনাকুনি পার হয়ে চলো, তারপর দেখবে একটা গলি, সেই গলি দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে একটা হলদে রঙের তিনতলা বাড়ি, সেই বাড়িতে আমি থাকি। তুমি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

দীপু বললো' চলুন।

অন্ধ লোকটির হাত ধরে দীপু পার্কটা পার হতে লাগলো। তারপর সেই গলির মধ্যে খানিকটা গিয়ে হলদে তিনতলা বাড়িটা পেয়ে গেল সহজেই।

সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দীপু বললো, এবার আমি যাই?

লোকটি বললেন, না, না, এখন যাবে কি। আমাকে একদম ঘরে পৌঁছে দাও। ভেতরে ঢুকে দেখবে একটা উঠোন, তার ডান পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠবো না। তুমি আমাকে সিঁড়ির পেছন দিকটায় নিয়ে চলো।

বাড়িটা তিনতলা হলেও মনে হয় যেন ফাঁকা। কোনো লোক-জনের সাড়া শব্দ নেই। এতবড় বাড়িতে কি আর কোনো লোক থাকে না? দীপুর একটু অবাক লাগলো।

সিঁড়ির পেছনে বেশ খানিকটা পরিষ্কার জায়গা। একটু একটু অন্ধকার। সাধারণতঃ এরকম জায়গায় বাড়ির যতসব ভাঙা জিনিস-পত্র থাকে।

অন্ধ লোকটি এবার দীপুর হাত ছেড়ে দিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। তারপর জামার পকেট থেকে বার করলেন একটা চাবি। মাটির মধ্যে একটি ছোট্ট গর্ততে লোকটি সেই চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতে কট করে শব্দ হলো।

দীপু আরও অবাক হয়ে গেল। কোনো তালা নেই, শুধু মাটির গর্ততে চাবি ঢোকাবার ব্যাপারটা সে বুঝলো না। তা ছাড়া লোকটি অন্ধ হলেও চাবিটা একেবারেই সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন কি করে?

মিষ্টির দোকানের আলমারিগুলোর পাল্লা যেমন ঠেললেই এক-দিকে সরে যায়, লোকটি এবার মাটিতে চাপ দিতেই সেরকম একটা

পাল্লা একদিকে সরে গেল। দীপু দেখলো নীচের দিকে একটা অন্ধকার গর্ত।

লোকটি নিজেই একবার দীপুর হাত ধরে বললেন, এসো।

দীপু জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায় যাবো?

লোকটি বললেন, এসোই না। তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি?

ভয় পাওয়ার কথা শুনলেই দীপুর সাহস বেড়ে যায়।

একজন অন্ধ লোকের সঙ্গে অন্ধকারে নামতে সে ভয় পাবে কেন?

ভেতরে পা দিয়ে দেখলো, একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। তবে সিঁড়িটা বেশ সরু। তুজনে পাশাপাশি নামা যায় না। অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না।

লোকটি বললেন, ঠিক গুণে গুণে ছত্রিশটা সিঁড়ির ধাপ নেমেই থামবে। তখন সামনে একটা দরজা দেখতে পাবে।

লোকটি আগে আগে নিজে নিজেই বেশ টপাটপ নেমে যেতে লাগলেন; নামতে নামতে দীপুকে বললেন, দেখো, যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে যেও না।

দীপু ভাবলো, বাঃ, বেশ মজা তো। অন্ধ লোকটি তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছেন, আর সে হোঁচট খাবে। অবশ্য অন্ধ লোকটির বারবার ওঠানামা করতে করতে বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে।

ছত্রিশটা ধাপ নামার পর দীপু থামলে। একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

অন্ধ লোকটি সামনের দেয়ালে হাত দিয়ে সুইচ টিপতেই ঝলমলে আলো জ্বলে উঠলো।

দীপু দেখলো, পাশাপাশি তুখানা তালা বন্ধ ঘর আর একটা ছোট্ট বারান্দা। কলকাতার কোনো বাড়িতে যে এ রকম মাটির নীচে ঘর থাকে, দীপু তা জানতো না। তার ধারণা ছিল যে আগেকার সব তুর্গ-তুর্গতেই শুধু মাটির নীচে সুড়ঙ্গ থাকতো।

লোকটি আবার পকেট থেকে একটা চাবি বার করে একটা ঘরের তালা খুলে ফেললেন। এবারেও তালায় চাবি পরাতে তাঁর একটুও দেরি হলো না।

ঘরটার মধ্যে একটা খাটে বিছানা পাতা, একটা চেয়ার টেবিল, আর মেঝেতে বেশ কয়েকটা খাঁচা। সেই খাঁচা-গুলোর মধ্যে একটা করে খরগোস রয়েছে।

ঘরে ঢুকে লোকটি একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বালাতেই তার থেকে খুব গাঢ় নীল রঙের আলো জ্বলে উঠলো।

লোকটি দীপুকে বললেন, বসো।

দীপু বললো, আপনি এখানে থাকেন? এই মাটির নীচে?

—হ্যাঁ, ওপরের আলো আমার ঠিক সহ্য হয় না।

—আচ্ছা আপনি তো পৌঁছে গেছেন, এবার আমি বাড়ি যাই।

—না, না, এক্ষুনি বাড়ি যাবে কি? তোমার নামটা এখনো জানা হলো না।

দীপু নিজের নাম জানালো। লোকটি বললেন, তাঁর নাম পিনাকপাণি। এরকম অদ্ভুত নাম দীপু আগে কখনো শোনেনি।

হাতে সাদা লাঠিটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে লোকটি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেললেন।

লোকটির দুচোখে দুটি ময়দার ডেলা লাগানো, অথবা কাচ জোড়ার জন্যে যে পুটিং লাগায় তাও হতে পারে।

হাত দিয়ে সেই ডেলা দুটো টেনে খুলে ফেলে লোকটি দীপুর দিকে চেয়ে হাসলেন।

লোকটি অন্ধ নয়।

দীপু একটু শিউরে উঠলো। অন্ধ নয়, তবু ইচ্ছে করে অন্ধ সেজে থাকে, তাহলে লোকটা কে? ডিটেকটিভরা অনেক সময়

ছদ্মবেশ নেয়। লোকটা তাই? কিংবা চোর বা গুণ্ডাও হতে পারে।

লোকটি বললেন, ভাবছো তো আমি চোর, গুণ্ডা কিংবা ডিটেক-টিভ কিনা? আমি ওসব কিছুই নয়। আমি সাধারণত আমার এ জায়গা ছেড়ে বাইরে যাই না। তবু মাঝে মাঝে দু'একবার যেতেই হয়। খোলা হাওয়া ও নিশ্বাস নেওয়াও তো দরকার। তখন অন্ধ সেজে না থাকলে আমার খুব অসুবিধে হয়।

দীপু ভাবলো, এ আবার কী কথা? চোখ থাকতেও কেউ কি অন্ধ সেজে থাকে? অন্ধ হলেই তো বেশী অসুবিধে।

লোকটি বললেন, এই নীল আলো ছাড়া অন্য কোনো আলো আমার সহ্য হয় না। তাছাড়া আরও গণ্ডগোল হয়। আমার চোখ নিয়ে মহা মুস্কিল। তোমার হাতে ওটা কী? খরগোশ?

দীপুর হাতে একটা হাফ পাউণ্ড পাউরুটি ছিল। অমনি সেটা জ্যান্ত হয়ে একটা খরগোশ হয়ে গেল।

দীপু চমকে সেটা ছেড়ে দিতেই খরগোশটা মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগলো।

দীপু খুব চমকে গেলেও সামলে নিল তাড়াতাড়ি। এ ব্যাপার-টায় সে ভয় পায় নি। লোকটি তাহলে ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজি-শিয়ানরা এরকম পারে। জাদুকর ম্যানড্রেকের ছবিতে দীপু এ রকম অনেক দেখেছে।

লোকটি গম্ভীর গলায় বললেন, আমি ম্যানড্রেকের মতন ম্যাজিক দেখাই না। আমি পিনাকপাণি!

দীপু এবার সত্যিই একটু ভয় পেয়ে গেল। লোকটি মনের কথ বুঝতে পারে। দীপু মনে মনে যা ভাবছে লোকটি তক্ষুনি সেট বলে দিচ্ছে।

পিনাকপাণি বললেন, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমার

চোখে একটা অসুখ হয়। চোখে ভীষণ ব্যথা করতো অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। অনেক ওষুধ লাগিয়েছি, কোনো ফল হয় নি। তখন আমার নাম ছিল বিজনকুমার বসু।

—তখন আপনার অন্য নাম ছিল?

—হ্যাঁ। তখন আমি জামসেদপুরে থাকতাম, স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করতাম। চোখে কোনো সময় আগুনের ঝাপটা লেগেছিল কিংবা অন্য কিছু হয়েছিল জানি না। সেই থেকে চোখে খুব ব্যথা। তারপর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে চোখ মেলবার পর দেখলাম, আমার আর একটুও ব্যথা নেই। আর আমার মাথার মধ্যে কে না বললো, তুমি বিজনকুমার বসু নও, তুমি পিনাকপাণি।

—কে বললো একথা।

—তা তো জানি না। আমার মাথার মধ্যে কেউ যেন ফিসফিস করে উঠলো। আমি তো প্রথমে খুব অবাক। কিন্তু মাথার মধ্যে অনবরত ঐ কথাটা শুনতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে পিনাকপাণি। তার কোনো উত্তর পেলাম না তখন।

দীপু মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, তার হাতের পাউরুটিটা তখনও খরগোশ হয়ে লাফাচ্ছে। দীপুর কাছে আর পয়সা নেই। মা তাকে পাউরুটি কিনে আনতে বলেছিলেন। পাউরুটির বদলে খরগোশ নিয়ে গেলে কি মা খুশী হবেন?

পিনাকপাণি অমনি দীপুর মনের কথা বুঝে নিয়ে বললেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তুমি পাউরুটি নিয়েই বাড়িতে ফিরবে।

দীপু একটু কেঁপে উঠলো। কেউ এমনভাবে মনের কথা বুঝে ফেললে দারুণ অস্বস্তি হয়।

পিনাকপাণি আবার বললেন, তোমাকে এসব কথা বলছি কেন জানো? আমি তো এতদিন রাস্তা দিয়ে ঘুরি অন্ধ সেজে, কিন্তু এর

আগে কেউ একজনও আমায় রাস্তা পার করে দিতে চায় নি। কলকাতা শহরের মানুষের মনে দয়া মায়া নেই। তুমিই প্রথম দিলে। অবশ্য আমার কোনো দরকার হয় না। আমি কিচ্ছু না দেখেও হাঁটতে পারি। একদিন একটা গাড়ি আমায় চাপা দিয়েছিল, কিন্তু আমি মরিনি।

দীপু বললো, আমাকে এবার বাড়ি যেতেই হবে। নইলে মা ভীষণ চিন্তা করবেন।

পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো আমি ভূত, তাই না? গাড়ি চাপা পড়ার পর মরে ভূত হয়ে গেছি? সত্যি আমি মরিনি। তুমি আমার হাতে চিমটি কেটে দেখো।

পিনাকপাণি নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন দীপুর কোলের কাছে। সত্যিই মানুষের মতন হাত। তাছাড়া দীপু তো ওঁর হাত ধরেই রাস্তা দিয়ে এনেছে।

পিনাকপাণি বললেন, আমি ইচ্ছে না করলে তো তুমি এঘর থেকে যেতে পারবে না। সেইজন্য চুপটি করে বসে আমার কথা শোনো। হ্যাঁ, সেই জামসেদপুরের কথা বলছিলাম। সেখানে আমার বউ ছেলে মেয়ে সব ছিল। আমার চোখ ভালো হয়ে যাবার পর আনন্দে সেই কথাটা সবাইকে বলতে গেলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরুলো না, শুধু গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগলো। তখন সবাই ভাবলো, আমি পাগল হয়ে গেছি।

দীপু আবার চোখ গোলগোল করতেই পিনাকপাণি বললেন, আমি কিন্তু সত্যিই পাগল হইনি। সে ব্যাপারে তোমার ভয়ের কিছু নেই। তবে একথা ঠিক, আমি এক জীবনে দু'জন মানুষ হয়ে গেছি। আগে ছিলাম বিজনকুমার বসু, এখন পিনাকপাণি। জামসেদপুরে আমার বাড়ির লোক আমাকে জোর করে পাগলা গারদে দেবার চেষ্টা করতেই আমি বাড়ি থেকে পালালাম।

স্টেশনে এসে সামনে যে ট্রেনটা দেখলাম, উঠে পড়লাম সেটাতেই। তখন আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে কে যেন বললো, কলকাতায় চলে যাও, হাজরা পার্কের পেছন দিকে একটা গলি, সেখানে হলদে রঙের তিনতলা বাড়ি...সেই বাড়ি তোমার।

দীপু বললো, এই পুরো বাড়িটা আপনার? তাহলে আপনি ওপরে না থেকে এই মাটীর নীচে থাকেন কেন?

—বললাম না, ওপরের আলো আমার সহ্য হয় না। আমার চোখটা বদলে গেছে বলেই মানুষ হিসেবে আমি বদলে গেছি। কী রকম আমার চোখের অবস্থা হয়েছে শুনবে? হাওড়া স্টেশন থেকে সেদিন যখন আমি আসছি, বড়বাজারের কাছে একটা পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। কী জানি কেন, সেই পুলিশটার ওপর আমার রাগ হলো। সে বোধহয় উল্টো পাল্টা হাত দেখিয়েছিল। আমি মনে মনে বললাম, এই পুলিশটা একটা গাধা। আর সঙ্গে সঙ্গে কী হলো জানো? পুলিশটা তক্ষুনি একটা গাধা হয়ে গেল। সত্যি সত্যি। আর কেউ বুঝতে পারলো না। সবাই ভাবলো পুলিশটা কোথায় চলে গেছে, আর সেখানে একটা গাধা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি তো সেদিকেই তাকিয়েছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ চেপে ধরলাম। ওঃ সেদিন কী ভয় পেয়েছিলাম!

কথা বলতে বলতে পিনাকপাণি নিজের চোখেও হাত চাপা দিয়ে ফেললেন, তারপর একটু বাদে হাত দুটো আবার সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, এটা একটা অভিশাপ। বুঝলে দীপু, এটা দারুন অভিশাপ। রাস্তাঘাটে এইজন্যই আমি অন্ধ সেজে যাই। কোনো মানুষের ওপর যদি আমার হঠাৎ রাগ হয়, তবে তার দিকে তাকিয়ে গরু, গাধা, ছাগল ভাবলেই সে সেইরকম হয়ে যায়।

খরগোশটা দীপুর আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দিল। দীপুর পায়ে চটি পরা, আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে। আর সেই আঙুলগুলোকে বোধহয় কোনো খাবার ভেবে খরগোশটা কামড়াচ্ছে।

দীপু খরগোশটাকে একটা লাথি কষালো।

সত্যিই খুব আশ্চর্য ব্যাপার, যেটা একটু আগে ছিল একটা পাউরুটি, সেটা এখন খরগোশ হয়ে গিয়ে রীতিমতন কামড়াচ্ছে। তার মানে এটা ম্যাজিকের খরগোশ নয়।

পিনাকপাণি খরগোশটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই একটা জায়গায় আমি হেরে যাই। আমি একটা পাউরুটিকে খরগোশ বানাতে পারি। কিন্তু সেই খরগোশটাকে আর পাউরুটির অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

বাইরের খরগোশটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে খাঁচার খরগোশ-গুলো লাফালাফি করছে।

পিনাকপাণি বললেন, এর একটাও আসল খরগোশ নয়। আগে অন্য জিনিস ছিল। এগুলোকে রেখে দিয়েছি কেন জানো তো। রোজ চেষ্টা করে দেখি, ওদের আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে অনো যায় কিনা। কিন্তু আমি এক জিনিষকে দু'বার পাল্টাতে পারি না। এসো তোমাকে পাশের ঘরটা দেখাই।

পিনাকপাণি বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের তালাটা খুললেন। সেই ঘরের মধ্যে একটা বোঁটকা গন্ধ। সেখানেও একটা নীল আলো জ্বালাবার পর দীপু দেখলো, সেই ঘরেও কয়েকটা খাঁচা রয়েছে। মোট পাঁচটা খাঁচা, তার মধ্যে দুটোতে দুটো ছাগল, একটাতে একটা বাঁদর, একটাতে একটা বেড়াল আর একটাতে একটা হরিণের বাচ্চা।

পিনাকপাণি বললেন, এরা আসলে সবাই মানুষ।

দীপুর বুকের মধ্যে দপ্ করে উঠলো। বলছে কী লোকটা। এরা সবাই মানুষ ? নাকি লোকটা আগাগোড়াই গাঁজা দিচ্ছে।

কিন্তু দীপুর হাতের পাউরুটিটাকে খরগোশ হয়ে যেতে তো সে নিজের চোখেই দেখেছে।

পিনাকপাণি বললেন, এরা আমার জন্যই বদলে গেছে। ঐ হরিণছানাটা আর বেড়ালটা আসলে দুটো মেয়ে। আর ছাগল দুটো আর বাঁদরটা তিনটে ছেলে। ওদের এখানে রেখে দিয়েছি কেন ? বাইরের কেউ ওদের মেরে ফেলতে পারে। আমি ওদের এখানে খুব যত্নে রেখেছি। আর রোজ চেষ্টা করি। ওদের যদি আবার মানুষ করে দিতে পারি। এখনো পারছি না।

দীপু ভাবলো, ওরে বাস রে। লোকটা যদি তাকেও ছাগল কিংবা বাঁদর কয়ে দেয় ? তাহলে আর সে কোনদিন মা বাবার কাছে ফিরতে পারবে না।

পিনাকপাণি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, না, তোমাকে অন্য কিছু করে দেবো কেন ? তোমার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি ? তুমি যে অন্ধ ভেবে আমায় রাস্তা পার করে দিয়েছো। আর কেউ কখনো দেয় নি।

দীপু বললো, আমি তা হলে এবার বাড়ি যাই ?

পিনাকপাণি কিছু উত্তর দেবার আগেই ওপর দিকে দুম দুম করে শব্দ হলো। কেউ যেন ওপরের দরজায় ধাক্কা মারছে।

পিনাকপাণি তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। একটু বাদেই ফিরে এলেন হাতে দুটো টিফিন কেরিয়ার নিয়ে।

তিনি বললেন, আমার আর এই ছেলেমেয়েদের খাবার। একজন চাকর রেখেছি। সে দু'বেলা খাবার দিয়ে যায়। তুমি কিছু খাবে ?

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, না, না, না।

—বাড়ি ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? একদিন না হয় একটু দেরি করেই ফিরলে। তোমাকে আমার আর একটু উপকার করতে হবে।

—আমি আপনার কি উপকার করবো?

—বলছি। তোমার সাহস আছে?

—কী জানি, জানি না।

খাঁচার বাঁদরটা কিচু-মিচু কিচু-মিচু করে ডেকে উঠলো।

পিনাকপাণি বললেন, এই ছেলেটার আগে নাম ছিল সুবোধ। ওর স্বভাব কিন্তু মোটেই সুবোধ ছিল না। হাজরা পার্কে গুণ্ডামি করে বেড়াতো আর খুব জ্বালাতন করতো লোকজনদের। একদিন কোনো কারণ নেই, আমি হাজরা পার্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ঐ ছেলেটা দৌড়ে এসে আমার পায়ে একটা ল্যাং মারলো, আমি পড়ে গেলাম, আর ও হাসতে লাগলো হো হো করে। ভেবে ছাখো, একজন লোককে শুধু শুধু ফেলে দিয়ে আনন্দ করা কি উচিত? আমি উঠে দাঁড়িয়ে রেগে মেগে বললাম, বাঁদর কোথাকার। তারপর থেকে ওর এই অবস্থা। কিন্তু ঐটুকু দোষ করার জন্য তো ওর সারা জীবন বাঁদর হয়ে থাকা উচিত নয়। তুমি ওর খাঁচার কাছে গিয়ে ওর নাম ধরে ডাকো তো?

দীপু বাঁদরের খাঁচাটার কাছে গিয়ে ডাকলো, সুবোধ। সুবোধ।

বাঁদরটা দারুণ ছটফট করতে লাগলো খাঁচার মধ্যে। মনে হয় ও ওর নাম শুনে চিনতে পেরেছে।

ছাগল, বেড়াল, আর হরিণ ছানাটাও এমনভাবে দীপুর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ওরাও মানুষের ভাষা বোঝে।

দীপুর গা ছমছম করতে লাগলো। এরকম অদ্ভুত অবস্থায় সে কোনদিন পড়ে নি।

পিনাকপাণি বললেন, এইবার তোমায় আসল কথাটা বলি। তোমায় দেখেই বুঝেছি, তুমি খুব ভালো ছেলে। তুমি যদি আমার একটা উপকার করো, তোমায় আমি রাজা করে দেবো।

—কী উপকার করবো আমি?

—বলছি। তার আগে ঘরের কোণে ঐ যে একটা কাঠের বাক্স গুলি দেখো? ওর মধ্যে মোহর ভর্তি আছে, ঐ সব মোহর তোমার হবে। সব আমি তোমাকে দিতে চাই।

—আমায় কী করতে হবে বলুন আগে।

পিনাকপাণি শার্টের তলায় হাত দিয়ে কোমর থেকে একটা লম্বা ছোরা টেনে বার করে বললেন, এই ছোরাটা নিয়ে আমার বুকে বসিয়ে দিতে হবে।

দীপু চোখ কপালে তুলে দারুণ একটা ভয়ের আওয়াজ করে বললো, অ্যাঁ?

পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো, আমি ইচ্ছে করে মরতে চাইছি? না, না, তা নয়। এছাড়া আর আমার অন্য কোন উপায় নেই। আমার মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে মাঝে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলে। সেই কথার জন্য আমি জামসেদপুর ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। সেই ফিস-ফিসে কথাই এই বাড়িটা খুঁজে দিয়েছি। মাটির তলায় যে এরকম ঘর আছে, তাও কি ছাই আমি জানতুম? সবই বলে দিয়েছে সে। সে যে কে তা আমি অনেকদিন জানতে পারি নি। এখন বোধহয় খানিকটা জানি। দ্যাখো, বাইরের আলো আমার সহ্য হয় না। যতদিন বাঁচবো আমাকে এই রকম মাটির নীচে থাকতে হবে। এরকম ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী। আমার বুকে যদি তুমি এই ছুরিটা বসিয়ে দিতে পারো তাহলেই বোধ হয় আমি বাঁচবো।

দীপু চীৎকার করে বললো, না। আমি কিছুতেই পারবো না।

—এসো, তোমায় আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

পিনাকপাণি আবার চলে এলেন পাশের ঘরে। তার শোবার খাটটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন দেয়ালের এক দিকে।

সেই খাটের তলায় একটা মস্ত বড় কাঠের বাক্স।

সেটা সাধারণ একটা বাক্স নয়। ওপরে নানান রকম রূপোর কারুকার্য করা। বেশ পুরোণো আমলের বাক্স বলে মনে হয়। সেটা প্রায় ঐ খাটেরই সমান।

পিনাকপাণি বললেন, ঐ বাক্সটা তুমি খুলে দেখো, দীপু।

--কী আছে ওর মধ্যে ?

—খুলেই ছাখো না।

—অতবড় বাক্স আমি খুলতে পারবো না।

—পারবে। ডালাটা ধরে টানলেই উঠে আসবে।

বাক্সটার কাছে গিয়েই ডালাটা ধরে ওঠাতেই দীপু ওরে বাবারে বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা সে ছেড়ে দিল আবার। ধপ করে একটা শব্দ হলো।

বাক্সের মধ্যে লাল ভেলভেটের বিছানায় শুয়ে আছে একটা মেয়ে। দারুন ফর্সা রং, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো নীল কাচের মতন। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটির দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু চামড়া একটুও কুঁচকোয় নি।

দীপু ফ্যাকাশে মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, ও কে ?

—আমি জানি না দীপু।

—আপনি ওর ওপরে ওর খাটে শুয়ে থাকেন ?

—হ্যাঁ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। মাঝে মাঝে ডালা খুলে দেখি, ওর চেহারা একই রকম আছে। পচে যায় না, গলে যায় না। এখন বুঝতে পারি ঐ মেয়েটিই আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে।

—আমি আর থাকতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যাবো।

—না দীপু যেও না। তোমাকে আমার এই উপকার করতেই হবে। ঐ মেয়েটি আমার মাথার মধ্যে ফিসফিস করে বলে, আমার বুকে ছুরি বসিয়ে মরে যেতে। কিন্তু আমি পারি না। কিছুতেই পারি না। অনেকবার চেষ্টা করেছি। নিজের বুকে ছুরি বসানো সহজ নয়। তুমি আমাকে এই সাহায্যটুকু করো দীপু।

না—আ—আ বলে এক চীৎকার দিয়ে দীপু দৌড়ালো, ঘর থেকে বেরিয়ে ডাকতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। পিনাকপাণি তাকে ধরতে পারলো না।

খানিকটা উঠে দীপু পেছন ফিরে দেখলো পিনাকপাণি ঘর থেকে বাহিরে এসেও দুহাতে নিজের চোখ চেপে রয়েছে।

ওপরের দরজাটা ঠেলে দীপু এলো বাইরে। তারপর দ্রুত ছুটে রাস্তায়। গাড়ি টাড়ি কিচ্ছু গ্রাহ্য না করে দীপু একইভাবে ছুটতে ছুটতে চলে এলো বাড়ীতে।

দীপুর মা সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে এত দেরী করলি কেন? পাউরুটি কোথায় গেল? আনলি নি?

দীপু হতভম্বের মতন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

তারপর আমতা আমতা করো বললো, পাউরুটিটা হাত থেকে পড়ে গেল, আমি আর তুললাম না, গড়িয়ে গেল ময়লার মধ্যে।

মা বললেন, বেশ করেছিস। ময়লা থেকে কে তোকে তুলতে বলেছে? কিন্তু এত দেরী হল কেন?

দীপু কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে মা ভাবলেন, পাউরুটিটা নষ্ট করে দীপু বুঝি লজ্জায় পড়ে গেছে। তাই আর কিছু বললেন না।

দীপু নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো।

বাইরে যখন যা দেখে, সে বাড়িতে এসে মাকে বলে। কিন্তু আজকের ঘটনাটা বলা যায়? একটা কথাও কেউ বিশ্বাস করবে। সব কিছুই যেন দারুণ অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য।

রাত্তিরবেলা শুয়ে দীপু ভাবতে লাগলো, সত্যিই কি আজ এইসব হয়েছে। সত্যিই কি সে রাস্তায় একটা অন্ধ লোককে দেখেছিল? সত্যিই মাটির নীচের অন্ধকার ঘরে কয়েকটা ছেলেমেয়ে বাঁদর, ছাগল, বেড়াল, আর হরিণ হয়ে আছে?

নাকি সবই স্বপ্ন?

বিছানায় শুয়ে দীপু ছটফট করতে লাগলো, আজ একটা বিকেলের ঘটনায় যেন তার জীবনটা বদলে দিয়েছে।

সবচেয়ে ভয়ংকর সেই খাটের তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকা মেয়েটি। লাল ভেলভেটের বিছানা, নীল রঙা শাড়ী পরা সেই মেয়েটিকে মনে হল পুতুলের মতন। কিন্তু পুতুল নয়। উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি মেয়ে, যেন কিছুক্ষণ আগেই জীবন ছিল, চোখ দুটো শুধু কাচের মতন।

সারারাত দীপুর ঘুম হলো না।

সকালবেলা মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর মুখটা এ শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

দীপু বললো, না, কিছু হয় নি।

একবার দীপুর ইচ্ছে হলো, সব কথা মাকে আর বাবাকে বলে দেয়। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই হাসবেন। দীপুকে পাগল ভাববেন।

সব কিছু ভুলে থাকার জন্য দীপু বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গেল।

কিন্তু খেলাতেও মন বসে না। বন্ধুদেরও কিছু বলতে পারে না।

দু তিনদিন পর দীপুর মনে হলো, ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্নই।

ওরকম অসম্ভব গাঁজাখুরি ব্যাপার আবার হয় নাকি?

একটা বাঁদরের সামনে সে সুবোধ সুবোধ বলে ডাকছিল, অমনি বাঁদরটা সাড়া দিয়েছিল। বাঁদরটা নিশ্চয়ই পোষমানা। ঐ ডাক ওকে শেখানো হয়েছে।

আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা অভিশাপ দিয়ে লোকজনকে হঠাৎ ভেড়া কিংবা গরু কিংবা সাপ বানিয়ে দিতেন। আজকাল কী আর তা হয়। লোকটা পাগল নিশ্চয়ই।

কিন্তু বাক্সের মধ্যে ঐ মেয়েটা?

নাঃ দীপু আর ঐসব কথা ভাবতে চায় না।

চারদিন পর বিকেলবেলা দীপু ইস্কুল থেকে ফিরছে। বন্ধুদের সঙ্গে সে মনোহর পুকুরের মোড় পর্যন্ত আসে, বাকি রাস্তাটা একলা। আপন মনে সে হাঁটছে, হঠাৎ পেছনে খটখট আওয়াজ হতে সে চমকে পেছন ফিরে তাকালো।

সেই লোকটা।

সেই পিনাকপাণি। সেই রকমই অন্ধ সেজে লাঠি ঠকঠকিয়ে আসছে। চোখে কালো চশমা।

এখন অন্ধ সেজে আছে, এখন আর দীপুকে দেখতে পাবে না।

দীপু দৌড়তে লাগলো।

একটুক্ষণের মধ্যেই দীপু রাস্তার বাঁকে চলে গেল। তারপর থমকে গিয়ে একটা বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি মারলো।

পিনাকপাণিও সেই পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর ফিসফিস করে ডাকলো, দীপু, দীপু।

দীপু, একেবারে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। লোকটা কি অন্ধ অবস্থাতেও দেখতে পায়?

সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে মারলো টেনে দৌড়।

বুদ্ধি করে দীপু নিজের বাড়িতে না গিয়ে কাছেই তার বন্ধু সুজিতের বাড়িতে ঢুকে পড়লো। ঐ লোকটাকে সে নিজের বাড়ি চেনাতে চায় না।

সুজিতদের বাড়ির দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলো, পিনাকপাণি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল পার্কের দিকে।

পরদিন ইস্কুলে টিফিনের সময় বেরিয়ে আলু কাবলি খেতে গিয়ে দীপু দেখলো রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পিনাকপাণি।

দীপু সুট করে ঢুকে এলো ইস্কুলের মধ্যে। তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। লোকটা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটা তাকে সহজে ছাড়বে না।

এখন কি উচিত লোকটাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া।

পুলিশ ওর বাড়ি সার্চ করলেই সব কিছু পেয়ে যাবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই দীপুর শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। পিনাকপাণি মনের কথা বুঝতে পারেন। দীপু ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার কথা ভাবছে এই কথা জানতে পেরে পিনাকপাণি যদি আগেই দীপুকে বাঁদর কিংবা ছাগল করে দেন ?

না, না, দীপু একথা কিছুতেই মনে আনবে না। একবার সে বাঁদর কিংবা ছাগল হয়ে গেলে কেউ তো আর তাকে মানুষ করে দিতে পারবে না। এমনকি পিনাকপাণি নিজেও পারবেন না।

স্কুল ছুটির পর দীপু দেখলো পিনাকপানি তখনো দাঁড়িয়ে আছেন উল্টোদিকে।

দীপু একদল বন্ধুর মধ্যে মিশে রইলো। মনোহর পুকুরের মোড়ে এসেও তিন চার জন বন্ধুকে বললো, চল আমাদের বাড়ি যাবি এখন একটু? আমার মা পায়েস বানিয়েছেন, তোদের খাওয়াবো।

পিনাকপাণি পেছন পেছন ঠকঠকিয়ে আসছেন ঠিক।

দীপু বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে গেল। পিনাকপাণি রাস্তার ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

সেদিন রাত্তিরবেলা খেতে বসে দীপু বাবাকে বললো, বাবা, আমি কয়েকদিনের জন্য চন্দননগরে যাবো? ছোট মাসীর বাড়িতে?

বাবা বললেন, হঠাৎ? এখন চন্দননগরে যাবি কেন?

—তুমি যে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

—ছুটি পড়ুক! এখন ইস্কুল খোলা, এখন যাবি কী করে?

—আজ তো শুক্রবার। কালকের দিনটি যদি ছুটি নিই, তাহলে শনি আর রবি দুদিন অন্তত চন্দননগরে কাটিয়ে আসতে পারি।

দীপু মনে মনে ভেবে রেখেছে, একবার চন্দননগরে গিয়ে পড়লে সে আর দশ বারোদিনের মধ্যে ফিরবে না। ছোট মাসীকে বলবে, যাতে তিনি জোর করে তাকে আটকে রেখে দেন। ছোটমাসীর সঙ্গে তার খুব ভাব।

বাবা বললেন হঠাৎ এখন চন্দননগরে যাবার এত গরজ কেন? পড়াশুনো নষ্ট করে এখন যেতে হবে না। গরমের ছুটি পড়ুক, তখন নিয়ে যাবো।

দীপু নিরাশ হয়ে গেল।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে ভাবলো, কাল ইস্কুলে যাবার নাম করে সে একাই চন্দননগরে পালাবে। সেখানে যাওয়া তো খুব সোজা। হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লেই হলো। চন্দননগর ষ্টেশনের আগে সে বাড়িতে একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালে বাবা নিজেই বললেন, আচ্ছা, চল, দীপু তোর যখন এত শখ হয়েছে, তোকে চন্দননগরেই রেখে আসছি আজ। ওখানে গিয়ে পড়াশুনো করতে হবে কিন্তু। ফাঁকি দিলে চলবে না।

বাবার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হলো দীপু।

সে যে-কোন উপায়েই কিছুদিনের জন্য এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল। রাস্তায় বেরুলেই সেই অন্ধ লোকটিকে দেখতে হবে, একথা ভাবলেই তার বুক ধড়ফড় করে।

চন্দননগরে ঠিক এগারো দিন থেকে এলো দীপু। আর এই ক'টা দিন তার দারুণ আনন্দে কাটলো। ছোটমাসীর বাড়ীর পেছনে রয়েছে একটা বাগান আর পুকুর। সেখানেই সারাদিন কেটে যায়। এই সুযোগে তার সাঁতারটা শেখা হয়ে গেল।

পিনাকপাণির কথা মনে পড়লেই সে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। না, ঐ লোকটির কথা সে আর কিছুতেই ভাববে না।

এগারো দিন পর বাবা এসে জোর করে নিয়ে গেলেন দীপুকে। এর আগে সে কক্ষনো একটানা এতদিন ইস্কুল ফাঁকি দেয় নি।

পরদিন ইস্কুল যাবার সময় সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। না, পিনাকপাণিকে কোথাও দেখা গেল না। টিফিনের সময়েও নেই। ছুটির সময়েও না।

যাক পিনাকপাণি নিশ্চয়ই তাহলে ভুলে গেছেন দীপুকে।

পরপর চারদিন দীপু নিশ্চিন্তভাবে রাস্তা দিয়ে ঘোরা ফেরা করলো খুব নিশ্চিন্তভাবে। পিনাকপাণির কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। তার মনে হলো, আর কোনোদিন দেখা হবে না পিনাকপাণির সঙ্গে। বাবা, পৃথিবীতে এত অদ্ভুত মানুষও থাকে।

শুধু বারবার দীপুর মনে পড়ে সেই খাঁচার বন্দী ছাগল, বাঁদর, বেড়াল আর হরিণ শিশুটির কথা। ওরা যদি মানুষ হয় সত্যিই, তাহলে সারা জীবন ওরা ঐ রকম হয়েই থাকবে? ইস, ওদের বাবা মায়েরা নিশ্চয়ই কত চিন্তা করে।

খবরের কাগজে যে প্রায়ই ছেলে মেয়েদের নিরুদ্দেশের খবর থাকে, হয়তো সেই সব ছেলে মেয়েদেরই কয়েকজন ঐ সেই মাটির নীচের ঘরে জন্তু হয়ে আছে।

এক বন্ধুর জন্মদিন ছিল শনিবার। সেখানে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে দীপু এমন সময় লোড শেডিং হয়ে গেল।

সমস্ত রাস্তা ঘুরঘুট্টি, অন্ধকার।

সাবধানে সে পা টিপে টিপে হাঁটছে, এমন সময় হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত দিল।

তারপরই ফিসফিস করে করে ডাকলো, দীপু, দীপু।

দীপুর শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। গলার আওয়াজ শুনেই সে চিনতে পেরেছে।

শরীরটা মুচড়ে কোনো রকমে কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে দীপু চেষ্টা করলো কোনো রকমে দৌড়ে পালাবার। কিন্তু পিনাকপাণি তাকে ধরে আছেন লোহার মতন শক্ত ভাবে।

দীপু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমায় ছেড়ে দিন।

পিনাকপানি বললেন, দীপু, আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো না। আমি কি ইচ্ছে করলে তোমায় আগেই ধরতে পারতাম না? আমি এক্ষুনি তোমাকে একটা বেড়াল বা টিয়া পাখি করে দিতে পারি। কিন্তু তা তো করিনি, দীপু। আমি তোমাকে পছন্দ করি বলেই তোমার ক্ষতি করতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

দীপু বললো, আমাকে এক্ষুনি বাড়িতে ফিরতে হবে। আমার ভীষণ কাজ আছে।

—তুমি ভয় পাচ্ছো? বললাম যে, তোমার ভয় নেই।

দীপু একবার ভাবলো চেঁচিয়ে উঠবে। রাস্তায় অনেক লোক আছে। অন্ধকার হলেও লোকেরা এসে তাকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে দেবে।

পিনাকপাণি বললেন, চেঁচিয়ে লাভ নেই, দীপু। আমার চোখ আজ খোলা। পকেটে টর্চ আছে। ইচ্ছে করলেই একবার তোমার ওপর ফেলে তোমাকে একটা বেড়াল বানিয়ে কোলে করে নিয়ে যেতে পারি। রাস্তার লোক কিছু বুঝতে পারবে না।

দীপু বললো, আমার কাঁধে লাগছে।

পিনাকপাণি বললেন, আমায় রাগিয়ে দিও না, দীপু! রাগিয়ে দিও না! একবার কিছু হলে আর যে ফেরাতে পারবো না।

দীপু সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, না, আমি যাচ্ছি, চলুন।

দীপুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে একটা হাত চেপে ধরে পিনাকপাণি সেই অন্ধকারের মধ্যেই গট্ গট্ করে হাঁটতে লাগলেন।

আগের দিন দীপু ওঁর হাত ধরে বড় রাস্তা পার করে দিয়েছিল। আজ পিনাকপাণিই দীপুকে নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে।

অন্ধকারের মধ্যে পিনাকপাণির হাঁটতে কোনো অসুবিধাই হয় না। জলের মাছ যেমন জলের মধ্যে স্বাভাবিক, সেইরকম পিনাকপাণিও যেন অন্ধকারেরই প্রাণী।

হাজরা পার্ক পার হয়ে গলির মধ্যে এসে পিনাকপাণি সেই বাড়িটাতে ঢুকলেন। সিঁড়ির নীচে মেঝের সঙ্গে আটকানো দরজাটার এক পাল্লা খোলাই ছিল, সেখান দিয়ে তরতর করে নেমে ওরা চলে এলো নীচে।

পিনাকপাণি ঘরের মধ্যে ঢুকে নীল আলোটা জ্বাললেন।

বাইরে লোড শেডিং থাকলে এখানে ঠিকই আলো জ্বলছিল। বোধ হয় এখানে অন্য ব্যবস্থা আছে।

পিনাকপাণি একটা চমৎকার ছোট কাঠের বাক্স দীপুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমাকে দেবো বলেই খুঁজছিলাম। তুমি এটা নাও।

দীপু বাক্সটা হাতে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—খুলে দেখো!

দীপু বাক্সটা খুললো। মনে হলো যেন ভেতরে অনেকগুলো পেতলের গোল গোল চাক্তি রয়েছে।

—ওগুলো কি জানো?

—না।

—ওগুলি সোনার মোহর। এক একটা মোহরের দাম অনেক; এসব মোহর এখন তোমার। এই মোহরগুলি মাটির তলার এই ঘরে ছিল, এগুলো কার আমি জানি না। আমার তো কোনো কাজে লাগবে না। আমি আর বাঁচবো না।

দীপুর গলা শুকিয়ে গেছে। এতগুলো মোহর পেয়ে সে কী করবে বুঝতে পারছে না। এগুলো নেওয়া কি তার উচিত?

পিনাকপাণি সঙ্গে সঙ্গে দীপুর মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, ওগুলো আমি তোমায় উপহার দিয়েছি, দীপু। তুমি একদিন আমায় রাস্তা পার করে দিয়েছিলে, আর কেউ কোনোদিন দেয় নি।

—কিন্তু আপনাকে তো পার করে দেবার দরকার ছিল না। আপনি নিজেই তো পার হতে পারেন?

—তুমি তো সেকথা জানতে না। তুমি তো সত্যিকারের একজন অন্ধ লোক ভেবেই রাস্তা পার করে দিতে চেয়েছিলে। তাতেই বুঝেছি তোমার মনটা খুব ভালো।

দীপু বারবার খাটের তলাটার দিকে চাইছে বলে পিনাকপাণি বললেন, তুমি ভাবছো, এখনো সেই মেয়েটা ওখানে আছে কি না? হ্যাঁ আছে। ঐ মেয়েটাই তো আমায় পাগল করে দিচ্ছে। তুমি দেখবে?

দীপু বললো, না, না, দেখতে চাই না।

পিণাকপাণি শুনলেন না। খাটটা সরিয়ে ফেললেন। তারপর নিজেই বাক্সের ডালাটা খুলে চিৎকার করে বললেন, কেন, কেন তুমি আমাকে মারতে চাও ?

দীপু দেখলো মেয়েটির ঠিক একই রকম চেহারা রয়েছে। খুব তাজা। চোখ দুটো খোলা। সেই নীল কাচের মতন চোখ।

পিনাকপাণি দেয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, আগে আমি পাগল ছিলাম না দীপু। আগে আমি ছিলাম জামসেদপুরের বিজন বসু। চাকরি বাকরি করতাম, বউ ছেলেমেয়ে ছিল, হঠাৎ একদিন আমি পিনাকপাণি হয়ে গেলাম। আমার মাথার মধ্যে কেউ ফিসফিস করে কথা বলে। এই মেয়েটাই বলে। আমি বুঝতে পেরেছি। আগে ফিসফিস করে নানারকম কথা বলতো। এখন শুধু একটাই কথা বলে। আমাকে মরতে বলে।

দীপু বললো, আপনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারেন না ?

—কোথায় যাবো ?

—অনেক দূরে। এই মোহরগুলো আপনি নিন্।

—তা হয় না, দীপু। আমি জানি, কোথাও গিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। আমার চোখটা বদলে গেছে। পৃথিবীর আলো আমি সহ্য করতে পারি না। মাঝে মাঝে অন্ধ সেজে চোখ বন্ধ করে যাই। আগে তবু একটু একটু চোখ খুলতে পারতাম, এখন আর দিনের আলোতে কিছুতেই চাইতে পারি না। চোখে ভীষণ জ্বালা করে।

—তাহলে অন্ধ সেজেই থাকবেন। কত লোক তো এমনিতেই অন্ধ, তবু তো তারা ভালভাবেই বেঁচে থাকে।

- আমি তা পারবো না। মাথার মধ্যে সবসময় ফিসফিস আওয়াজ। যেখানেই যাই, ঐ আওয়াজ আমাকে ছাড়বে না, হয় আমাকে পাগল করে দেবে, কিংবা এখানে টেনে আনবে। তুমি

চন্দননগরে গিয়েছিলে,. সেখানেও আমি তোমার খোঁজে গেলুম—

——আমি চন্দননগরে গিয়েছিলাম, তাও আপনি জেনে ফেলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, এই ক্ষমতাও আমার নতুন হয়েছে। আমি একবার যাকে দেখি, তার মনের সব কথা ছবির মতন দেখতে পাই। চন্দননগরে একটা হোটেল ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলাম না রাত্তিরে। মাথার মধ্যের ফিসফিসে আওয়াজ বার বার চলতে লাগলো, ফিরে এসো, ফিরে এসো। ঠিক যেন চুম্বকের টানে ফিরে এলাম।

কোমর থেকে সেই বড় ছোরাটা বার করে পিনাকপাণি বললেন, এই আওয়াজটা রোজ আমাকে বলছে, এই ছোরাটা দিয়ে আত্মহত্যা করতে। আমি এই ছোরাটা হাজরা পার্কে মাটি খুঁড়ে পুঁতে এসেছিলাম। নিজের কাছে রাখতে চাইনি। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে নিজেই আবার সেটাকে তুলে নিয়ে এলাম। পারলাম না, বুঝলে দীপু। পারলাম না।

দীপুর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। কাঠের বাক্সটায় ডালাটা খোলা, সেই মেয়েটার দিকে যতবার চোখ যাচ্ছে, ততবারই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একটা মরা মেয়ে কতদিন ধরে ঐ বাক্সটার মধ্যে রয়েছে কে জানে। পচে না। গলে না।

আর পিনাকপাণির হাতে ঐ অতবড় ছোরা। ওঁর চোখ দুটো এখন সত্যিই যেন পাগলের মতো মনে হচ্ছে। দীপু যদি এখনো পালিয়ে যেতে পারতো।

পিনাকপাণি বললেন, ব্যাপারটা আমি অনেকটা আন্দাজ করতে পারছি। অনেকদিন আগে মনে হয় কয়েক জন্ম আগে পিনাকপাণি নামে একটা লোক মেয়েটিকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। কিংবা এই মেয়েটিকে সে-ই বোধহয় খুন করেছিল।

তারপর পিনাকপাণিও অন্য কোথাও গিয়ে মরে যায়, ওদের দুজনের আত্মাই মুক্তি পায় নি। এই পৃথিবীতে একজন আর আর একজনকে তাড়া করে ফিরছে। তারপর সেই পিনাকপাণি বোধহয় আমার অর্থাৎ বিজন বসুর শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

দীপু বললো, আমি কি এবার যাবো ?

—না দীপু তোমার সাহায্য যে আমার খুব দরকার।

—আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কিছুতেই পারবো না।

— আমি নিজেও যে পারছি না, দীপু। মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু নিজে কি নিজের বুকে ছোরা বসানো যায় ? অনেকবার চেষ্টা করেও পারি নি।

--আমি পারবো না। কিছুতেই পারবো না।

—কেউ তো এখানে দেখবে না। কেউ এখানে আমাদের খুঁজে পাবে না। তুমি পালিয়ে যেয়ো। ওপরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে কেউ কোনো দিন আর আমাদের খুঁজে পাবে না।

—না, না, না।

—তুমি এক কাজ করো, দীপু শুধু একটা কাজ—

—না, না, আমার পাপ হবে।

—হবে না, তোমার পাপ হবে না। সব পাপ আমার। পিনাকপাণি দীপুকে জোর করে টেনে এনে একটা দেয়ালের সামনে দাঁড় করে দিলেন। তারপর ছোরাটা দীপুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।

দীপু কিছু বোঝবার আগেই পিনাকপাণি দীপুর হাতের ছোরাটার ওপর বুক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছোরাটা ওঁর বুকে সম্পূর্ণ গেঁথে গেল।

পিনাকপাণি একটুও শব্দ করলেন না। সেই রকম ছোরা বেঁধা অবস্থাতেই কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এইবার তোমার ছুটি——দীপু তুমি যাও—এবার আমারও ছুটি।

তারপর পেছন ফিরে টলতে টলতে এক পা এক পা করে সেই কাঠের বাক্সটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, এইবার আমি এসেছি—আমি এসেছি।

রক্তমাখা মুখ নিয়ে পিনাকপাণি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মরা মেয়েটির ওপর।

অমনি মেয়েটি উঠে বসে বিকট গলায় হি হি হি হি করে হেসে উঠলো।

দীপু আর সহ্য করতে পারলো না। ঝুপ করে সেখানেই পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

কতক্ষণ সে ভাবে অজ্ঞান হয়েছিল, দীপু জানে না। তার জ্ঞান ফিরলো কয়েকটি ছেলেমেয়ের চিৎকারে। কোথায় যেন কারা খুব ভয় পেয়ে কাকে ডাকছে।

দীপু চোখ মেলে দেখলো পিনাকপাণির মৃতদেহটা পড়ে আছে মাটিতে। কিন্তু কাঠের বাক্সের মধ্যে সেই মেয়েটি নেই, সে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দীপু কোনক্রমে উঠেই দৌড় লাগাতে গেল। তখন সে বুঝলো চ্যাঁচামেচি আসছে পাশের ঘর থেকে।

সেই ঘরটাতে খাঁচাগুলোর মধ্যে ছাগল, বাঁদর, বেড়াল বা হরিণ আর নেই। বরং দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে বন্দী।

দীপু এক এক হ্যাঁচকা টানে খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিতেই ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে এলো।

ওরা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো আমরা কোথায়? কে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে?

দীপু বললো, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবার এখন সময় নেই। শিগগির পালাও।

দীপু মোহরের বাক্সটা তুলে নিয়ে নিজেই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো বাইরে। তারপর সে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে গেল।

মোহরের রাক্সটা দীপু খুব গোপনে লুকিয়ে রেখেছে। আজও কোনো কথা সে বাবা মাকে বলে নি। অন্তত চার পাঁচ বছর কেটে না গেলে, সে কারুকে কিছু জানাতে চায় না।

কাঠের বাক্সের সেই মেয়েটি যে কোথায় গেল, দীপু এখনো তা জানেনা। এখনো সেই মেয়েটির হাসির কথা ভাবলে তার বুক গুড়গুড় করে।

পিনাকপানির জন্য তার মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। পিনাকপাণিই হোক বা বিজনকুমার বসুই হোক, লোকটি খুব খারাপ ছিল না। তবে পিনাকপাণি মরে গিয়েছিল বলেই যে ছাগল, বাঁদর, বেড়াল আর হরিণরা আবার মানুষ হয়ে গেল, একথা ভেবে দীপুর আবার মনে হয়, লোকটা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।

খরগোশগুলোর কী অবস্থা হয়েছিল৷ তা আর দীপু দেখেনি। তবে ওরা মানুষ ছিল না নিশ্চয়ই। তাহলে পিনাকপাণি বলতেন। হয়তো অন্য কোনো জানোয়ার। তারা শেষ পর্যন্ত খাঁচাতেই বন্দী থেকে গেছে।

ডাকাতের পাল্লায়

ভুটানে বেড়াতে গিয়ে একদিনও খবরের কাগজ পড়িনি। পাহাড়, নদী আর আকাশ দেখেই চোখ ভরে থাকতো। ছাপা অক্ষর পড়ার কাজ থেকে চোখ দুটোকে ছুটি দিয়েছিলাম।

তারপর একদিন ভুটান থেকে আমরা নেমে এলাম। সমতলে। উঠলাম গিয়ে বরডাবরি বাংলোয়। সেখানে আর দু'দিন কাটিয়ে তারপর কলকাতায় ফেরা।

সেই বাংলোয় বসবার ঘরে দেখলাম একটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। অমনি পুরোনো অভ্যেসটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। টেনে নিলাম কাগজটা।

তাতে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। সেবক রোডে গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ডাকাতি হয়ে গেছে!

বাংলোর চৌকিদার কাছেই ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শুনেছো ডাকাতির কথা?

সে চোখ বড় বড় করে বললো, ওরে বাবা, সে কথা আর বলবেন না, সাহেব! সন্ধের পর আজকাল আর কেউ রাস্তায় বেরোতেই চায় না। একে এদিকে রয়েছে পাগলা হাতির উপদ্রব, তার ওপর শুরু হয়েছে ডাকাতদের হামলা!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী করে এই ডাকাতরা?

চৌকিদার বললো, এরা কোথা দিয়ে যে কখন আসবে তা বোঝার উপায় নেই। এরা লুকিয়ে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। রাত্তির বেলা হঠাৎ বড় রাস্তার ওপর একটা মোটা গাছের গুঁড়ি ফেলে গাড়ি আটকে দেয়। তারপর তিন চার জন বন্দুক হাতে নিয়ে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বাধা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলে। এ পর্যন্ত দুটো

গাড়ির ড্রাইভারকে মেরেছে। পুলিশ এদের কিছুতেই ধরতে পারছে না।

খবরের কাগজেও দেখলাম, প্রায় ঐ এক কথাই লিখেছে। তবে, দুটো গাড়ির ড্রাইভারকে মেরে ফেলার কথাটা সঠিক নয়, তারা আহত হয়ে হাসপাতালে আছে। আর একটা গাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

ডাকাতরা সংখ্যায় মাত্র তিন-চার জন। ছোট ছেলেদের যেমন খেলবার মুখোশ পাওয়া যায়, তারা সেই রকম মুখোস পরে থাকে। পুলিশ এখনো কোন খোঁজ পায় নি।

আমি খবরের কাগজটা টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেললাম। ঝর্ণা মাসী দেখে ফেললে আবার মুস্কিল হবে। কারণ, আমাদের ফিরতে হবে ঐ সেবক রোড দিয়েই।

কিন্তু ঝর্ণা মাসীর ছেলে বুবুন শুনে ফেলেছিল আমার আর চৌকিদারের কথাবার্তা। সে খাবারের টেবিলে বসে হঠাৎ বলে ফেললো, মা, আজ সন্ধেবেলা ডাকাত দেখতে যাবে? এখানে রোজ মুখোস পরা ডাকাত বেরোয়?

আর চেপে রাখা গেল না। ডাকাতদের কথা এসে পড়লোই। মেসোমশাই বললেন, আমিও শুনছি, খুব ডাকাতি হচ্ছে এদিকে। গেটের সামনে কয়েকজন লোক বলাবলি করছিল। পরশুদিনও নাকি তিস্তা ব্রীজ পেরিয়ে মাইলখানেক দূরে সেবক রোডের ওপর একটা ডাকাতি হয়েছে।

ঝর্ণা মাসী বললেন, তাহলে আমরা কুচবিহার দিয়ে যাবো।

মেসোমশাই বললেন, কেন?

ঝর্ণা মাসী বললেন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন যেতে হলে সন্ধের পর ঐ সেবক রোড দিয়ে যেতে হবে। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সঙ্গে এত জিনিস পত্তর।

এই রে, ঝর্ণা একবার মাসী গোঁ ধরলেই মুস্কিল! কুচবিহার দিয়ে

যাওয়া মানে এক ঝামেলা। অনেক সময় লেগে যাবে। আর এ দিক দিয়ে নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরলে আমরা পরদিন ভোরেই কলকাতায় পৌঁছে যাবো।

বুবুন বললো, 'না, মা আমরা ঐ ডাকাতের রাস্তা দিয়ে যাবো! আমরা ডাকাত দেখবো!'

ঝর্ণা মাসী এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্ তো। বড় দুষ্ট হচ্ছিস্ দিন দিন।'

কাছাকাছি একটা চা-বাগানের ম্যানেজার মেসোমশাইয়ের বন্ধু। পরদিন দুপুরে আমরা নেমতন্ন খেতে গেলুম তাঁর বাংলোয়।

কথায় কথায় ডাকাতের প্রসঙ্গ উঠলো।

ম্যানেজারের নাম অজয়বাবু। তিনি বললেন, 'আপনারাও ডাকাতের কথা শুনে ভয় পেয়েছেন নাকি?'

ঝর্ণা মাসী বললেন, 'ভয় পাবো না? ডাকাতদের কে না ভয় পায়।'

বুবুন বললো, 'আমি ভয় পাই না।'

অজয়বাবু বুবুনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এই তো চাই!'

তারপর তিনি ঝর্ণা মাসীর দিকে ফিরে বললেন, বাঘ, হাতি আর ডাকাতদের নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। আমাদের কী আর ওসবে ভয় পেলে চলে?'

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা আজ ঐ রাস্তা দিয়ে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরবো ভেবেছিলাম, কিন্তু চিন্তা হচ্ছে।'

অজয়বাবু বললেন, 'চিন্তার কী আছে? আমার জিপ গাড়িটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। যদি ডাকাতরা আসেও, জিপ গাড়ি দেখলেই ভাববে পুলিশের গাড়ি, অমনি পালাবে! যদি চান তো আমার বন্দুকটাও দিয়ে দিতে পারি সঙ্গে!'

বুবুন বললো, 'হ্যাঁ বন্দুকটা চাই? 'ডাকাত এলেই গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে গুলি করে দেবো!'

ঝর্ণা মাসী বললেন, 'বন্দুক তো দেবেন, কিন্তু সেটা চালাবে কে?'

অজয়বাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, আপনারা কেউ জানেন না?'

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম. কোনদিন আমি একটা সত্যিকারের বন্দুক হাতে নিয়েই দেখিনি। মেসোমশাই নাকি এক কালে শিকার করতেন। কিন্তু ঝর্ণা মাসী সে কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং মেসোমশাইও চুপ করে রইলেন।

অজয়বাবু বললেন, 'সে দরকার পড়লে আমার ড্রাইভারই বন্দুক চালাতে পারবে। দরকার হবে না অবশ্য ··আমি নিজেই আপনাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমার আবার একটা বিশেষ কাজ আছে···'

বিকেল থাকতে থাকতেই আমরা জিপ গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝর্ণা মাসী বললেন, 'না হয় বেশীক্ষণ স্টেশনে বসে থাকবে, কিন্তু সন্ধের পর ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার দরকার নেই।'

রাস্তাটা কিন্তু চমৎকার। দু'পাশে চা বাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গেছে এঁকে বেঁকে। সমতল ভূমি ছাড়িয়ে এক সময় পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে হয়। তারপর তিস্তা নদীর ওপর করো-নেশান ব্রীজ। এমন সুন্দর জায়গা খুব কমই আছে। বিরাট চওড়া এখানে তিস্তা নদী ঠিক যেন রূপো গলা জল। ব্রীজ পেরিয়ে ডান দিকে গেলে কালিম্পং-এর রাস্তা। আমার যাবো ডান দিকে।

বিকেল শেষ হয়েছে, হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। এসব পাহাড়ী জায়গায় আস্তে আস্তে সন্ধে নামে না। যাই হোক আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো।

সারাটা রাস্তা বুবুন ব্যাকুলভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকেছে। তার খুব আশা ছিল যে-কোনো মুহূর্তে পাশের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি কিংবা একদল ডাকাত বেরিয়ে আসবে! কিন্তু সে রকম রোমাঞ্চকর কিছুই ঘটলো না।

আমাকে সে বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'ও নীলুদা, বলো না, ডাকাতদের কী রকম দেখতে হয়?'

ওর ধারণা, ডাকাত বুঝি ভূত বা দৈত্যের মতন আলাদা ধরনের কিছু।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বড় বড় কান, চোখ দুটো দিয়ে আগুন জ্বলে, ডাকাতদের হাতে নোখও থাকে খুব বড় বড়...'

পাহাড়টা সবে পার হয়ে আমরা সমতল রাস্তায় এসেছি, এমন সময় ঘ্যাস্-স ঘ্যাস্-স আওয়াজ করে আমাদের জিপ গাড়িটা থেমে গেল।

ঝর্ণা মাসী আঁতকে উঠে বললেন, 'কী হলো? কী হলো'?

ড্রাইভারটি নেপালী এবং খুব গম্ভীর। সে কোনো কথা না বলে রেগে গিয়ে গাড়ির বনেট খুললো। তারপর খুটখাট করতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

ঝর্ণা মাসী বললেন, কী হলো, এই নীলু, নেমে দ্যাখ না!

বাইরে শীতের ফিনফিনে হাওয়া, তাই নামতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আর না নেমে উপায় নেই। ড্রাইভারটির পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেয়া হুয়া? কতক্ষণ বাদ চলে গা?

ড্রাইভার খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, নেই চলে গা!

—অ্যাঁ?

ততক্ষণে মেসোমশাইও নেমে এসেছেন, আমার চেয়ে গাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যাপার তিনি ভালো বোঝেন। তিনি ভালো করে দেখে বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!

গাড়ির রেডিয়েটার ফুটো হয়ে সব জল পড়ে গেছে রাস্তায়। আর ফ্যান বেল্টও ছিঁড়ে গেছে। এখন এই গাড়ি চালাবার আর কোনো উপায়ই নেই।

ছোট মাসী সে খবর শুনে দারুণ রেগে গিয়ে বললেন, তোমার ঐ

অজয়বাবুটার কী আক্কেল? এরকম একটা পচা গাড়ি দিয়ে আমাদের পাঠিয়েছে!'

মেসোমশাই বন্ধুর সমর্থনে দুর্বলভাবে বললেন, আহা, যন্ত্রপাতির কথা কি বলা যায়: কখন কোন্‌টা খারাপ হয়!

এখন কী উপায়?

মেসোমশাই ছোট মাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এদিক থেকে আরও গাড়ি যাবে তো, তাদের কাউকে বললে আমাদের নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

ঝর্ণা মাসী জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এখানে জঙ্গলের মধ্যে কে তোমার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকবে?

ঝর্ণা মাসী আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুই আবার হাসছিস? তোর লজ্জা করছে না; তখনই আমি বলেছিলাম কুচবিহার দিয়ে যেতে—

এ রাস্তায় গাড়ি চলাচল সত্যি খুব কমে গেছে। অন্য সময় লরি আর প্রাইভেট গাড়ি যায়। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেও একটাও গাড়ি এলো না। সবাই কি ডাকাতের ভয় পেয়েছে? লরি তো কখনো বন্ধ হয় না। অন্তত একটা পুলিশের গাড়ি এলেও তো পারতো!

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। একটু কাছে আসতে দেখা গেল, ট্রাক। একটা নয়, পরপর তিনটে। আমরা হল্লা করতে লাগলাম, এই থামো থামো, আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, থামো!

তারা তো থামলোই না, বরং যেন আরও স্পীড বাড়িয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার দুটো ট্রাক এলো পরপর। এবার আমরা

আরও জোরে চ্যাঁচালাম, এবারও তারা না থেমে চলে গেলো একই ভাবে।

আবার অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ির আলো যেই দেখলাম, অমনি আমরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলাম তিনজন। ছ' হাত তুলে চ্যাঁচাতে লাগলাম। আর যাই হোক, আমাদের তো চাপা দিতে পারবে না!

প্রায় চাপাই দিচ্ছিল আর একটু হলে। শেষ মুহূর্তে আমরা লাফিয়ে পড়লাম রাস্তার পাশে, ট্রাকটাও ব্রেক কষলো। আমি দৌড়ে ড্রাইভারের জানালার কাছে গিয়ে বললাম, বহুত বিপদে পড়া হ্যায়..হাম্ লোককো ট্রেন পাকড়ানে হোগা. গাড়ি খারাপ হুয়া ..

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে আমার মুখে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে। গাড়িটাও এর মধ্যে স্টার্ট নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

ঝর্ণা মাসী বললেন: কী পাজী, কী শয়তান ওরা! নীলু, তোর বেশী লাগেনি তো?

ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে আমি বললাম, একটা জিনিস বোঝা গেল, কোনো গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে না। দিনকাল খারাপ বলে অচেনা লোককে কেউ তুলতে চাইছে না।

এবার মেসোমশাইয়ের মুখটা কালো হয়ে এলো। কোনো গাড়ি যদি আমাদের না নিয়ে যায়, তা হলে কী উপায় হবে? জিপটাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে চালাবার কোনো উপায়ই নেই। সারা রাত কি তাহলে আমরা পথের পাশে বসে থাকবো?

দু'পাশে ঘন জঙ্গল। রাত্রিবেলা অন্ধকার জঙ্গলে গা ছমছম করে। এদিকে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। অবশ্য দু' একটা বাঘ ছিটকে চলেও আসতে পারে। আর আসতে পারে হাতি।

অনেক সময়ই এই সব জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হয়। কিছুদিন আগেই আমরা জয়ন্তিয়ার কাছে দেখেছি যে হাতির দঙ্গল এলেই সেখানে একটা আধটা বন্দুক থেকেও বিশেষ লাভ নেই। তাদের খেয়াল হলে তারা আমাদের সবাইকে পায়ের তলায় পিষে চ্যাপ্টা করে দিয়ে যেতে পারে!

এছাড়া ডাকাতের ভয় তো আছেই। সারা রাত আমাদের এখানে ডাকাতের ভয় নিয়ে বসে থাকতে হবে।

তার চেয়েও বড় ভয় শীত। সারা রাত যদি জিপের মধ্যে বসে থাকতে হয় তা হলে আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাবো একেবারে। বাঘ, হাতি আর ডাকাতের ভয় নিয়ে এই দারুণ শীতের রাত কাটানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ ঝর্ণা মাসী আর বুবুনকে নিয়েই চিন্তা।

অথচ আর কী-ই বা করার আছে?

মেসোমশাই ঘড়ি দেখলেন। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে দার্জিলিং মেল ছেড়ে যাবে। অথচ সেখানে পৌঁছোবার কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ তিনি খুব রেগে গিয়ে নেপালী ড্রাইভারটিকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, কাঁহে এইসা খারাপ গাড়ি লেকে আয়া?

সে বললো, হাম্ কেয়া করেগা সাব!

জঙ্গলে কিছু একটা আওয়াজ হলেও আমরা চমকে উঠছি। শুকনো পাতার খস খস শব্দ, কে যেন হেঁটে আসছে! একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল। সেদিকে টর্চ ফেলেও আর কিছু দেখা গেল না। কেউ কি লুকিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে?

ঝর্ণা মাসীও এখন আমাদের বকুনি দিতে ভুলে গেছেন।

বুবুন আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। মেসোমশাই ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছেন!

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় উল্টোদিকের জঙ্গলের মধ্যে

একটা গাছের ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়।

আমি আর মেসোমশাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। এই রকমভাবে কাটাতে হবে সারা রাত? এরকম চমকে চমকে? অথচ অন্য কী যে করা যায়, ভেবেই পাচ্ছি না।

এই সময় উল্টোদিকের রাস্তায় একটা হেড লাইটের আলো দেখা গেল। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমরা যেদিকে যাবো, গাড়িটা আসছে সেইদিক থেকেই। জোরালো আলো দেখেই বোঝা যায়, ওটাও একটা ট্রাক।

নেপালী ড্রাইভারটি হঠাৎ বললো, সাব, ট্রাক রোকে গা?

মেসোমশাই বললেন, ট্রাক থামাবে? কি করে?

সে সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। তারপর দৌড়ে গিয়ে জিপ থেকে নিয়ে এলো বন্দুকটা। তারপর সে আর একটা কাজ করলো। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বার করে সেটা বেঁধে ফেললো মুখে। অমনি তার মুখখানা হয়ে গেল মুখোসের মতন।

সে আমাকে বললো, সাব, আপ ভি হামারা সাথ আইয়ে।

তার কোমরে একটা ভোজালি ছিল। সেটা খুলে সে আমার হাতে দিল। তারপর ইঙ্গিতে বোঝালো, আমারও মুখে একটা রুমাল বেঁধে নিতে।

মেসোমশাই উত্তেজিতভাবে আবার ঘড়ি দেখে বললেন, ছাখো যদি ট্রাকটা থামাতে পারো, তা হলে এখনো দার্জিলিং মেল ধরা যেতে পারে।

আমি আর নেপালী ড্রাইভারটি গিয়ে দাঁড়ালাম রাস্তার মাঝখানে। মেসোমশাই তখন ঝর্ণা মাসী আর বুবুনকে নিয়ে জিপের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

হেডলাইটের আলো ঠিক যখন আমাদের মুখে এসে পড়েছে,

সেই সময় নেপালী ড্রাইভারটি বন্দুকের মুখ আকাশের দিকে তুলে গুড়ুম করে একটা গুলি চালালো ! আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ট্রাকটা যদি না থেমে আমাদের চাপা দিতে আসে তাহলে শেষ মুহূর্তে পাশের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমি তৈরি হয়েছিলাম।

কিন্তু ট্রাকটা থেমে গেল।

নেপালী ড্রাইভারটি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ড্রাইভারের কাছে ছুটে গিয়ে বললো, রুখ্ যাও ? নেহি তো খতম কর দেগা !

আমি অন্যদিকের জানালায় লাফিয়ে উঠে ভোজালি দেখিয়ে বললাম, খবরদার !

ট্রাকের ড্রাইভার ভয় পেয়ে বললো মারিয়ে মাৎ ! মারিয়ে মাৎ।

আমি আবার নেমে পড়ে চলে গেলাম ট্রাকের পেছন দিকে। সেখানে প্রচুর মাল পত্র রইলেও খানিকটা জায়গা খালি আছে। জিপ থেকে আমাদের মালপত্রগুলো এনে ছুঁড়ে দিলাম সেখানে। তারপর ঝর্ণা মাসী আর বুবুনকে টেনে হিঁচড়ে তুলে দিলাম ওপরে। মেসোমশাইও গিয়ে বসলেন ওদের পাশে।

আমি আবার ড্রাইভারের জানালার পাশে লাফিয়ে উঠে বললাম, গাড়ি ঘুমাও !

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকটা ড্রাইভারের কপালে ঠেকিয়ে বললো, আভি গাড়ি ঘুমাও !

ড্রাইভারের পাশে একজন শুধু ক্লিনার বসেছিল। সে বেচারী একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। আমি তার গায়ে খোঁচা মেরে বললাম, এই হাট্‌কে বৈঠো না।

ড্রাইভার ট্রাকটা ঘোরালো খুব অনিচ্ছার সঙ্গে। কিন্তু তার আপত্তি করবার উপায় নেই, কারণ কানের পাশেই বন্দুকের নল।

গাড়ি ঘোরাবার পর আমি বললাম, জোরসে চালাও।

বাইরে বেশ কনকনে হাওয়া বলে আমি ভেতরে এসে বসলাম ভোজালি উঁচিয়ে। নেপালী ড্রাইভার বাইরেই রইলো, নইলে বন্দুকটা তাক করা যাবে না! আমার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই, তা হলে মুখ থেকে রুমালটা খুলতে হয়।

এখনো জোরে গেলে ট্রেনটা ধরতে পারি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। আমি ভোজালিটা একবার ড্রাইভারের চোখের সামনে ঘুরিয়ে বললাম, জোরসে চালাও! আউর বহুত জোর।

নেপালী ড্রাইভারটিও বন্দুকের খোঁচা মেরে বললো, বহুত জোরসে!

ট্রাক-ড্রাইভার ভাবলো, আমরা বুঝি পুরো ট্রাকটাই লুঠ করতে চলেছি।

দুর্দান্ত জোরে ছুটলো। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই দূরে দেখা গেল শহরের আলো। সে এবার একটু একটু টেরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। যেন সে অবাক হয়ে ভাবছে, শহরের মধ্য দিয়ে আমরা যাবো কী করে?

সে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেই তো আমরা ধরা পড়ে যাবো!

আমি আবার বললাম, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চলো! জোরসে। বহুত জোরসে।

সে বললো, কেয়া? রেল স্টেশন?

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মুখের রুমালটা খুলে ফেললাম। নেপালিটিও বন্দুক নামিয়ে বললো, স্টেশান আগেয়া?

সেদিন ট্রাক-ড্রাইভারটি ডাকাতের পাল্লায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে একশো টাকা বখশিশ পেয়েছিল অবশ্য।

ছোটমামার ব্যাপারটা

ছোট মামা আড়ষ্ট গলায় বললেন, ঐ ছাখ নীলু!

সামনের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললাম। একটা খুবই নিরীহ চেহারার কুকুর। একদম নেড়ি কুত্তা যাকে বলে, রোগা, লম্বাটে, মুখখানা ভীতু ভীতু। এই কুকুরটাকে দেখেও ছোটমামার ভয়। অথচ মজা এই যে ছোটমামার জানোয়ারে ভীষণ ইন্টারেস্ট, যদি সেটা খাঁচার জানোয়ার হয়। এখনও এই বয়সে প্রতিমাসে একবার করে চিড়িয়াখানা যাওয়া চাই।

গ্রামের রাস্তা, কাদায় একেবারে চটচটে। ছ'পাশে মাঠ, মাছখান দিয়ে উঁচু রাস্তা। প্রত্যেক বছরই বোধহয় রাস্তাটায় নতুন মাটি ফেলা হয়, আর বর্ষার সময় সেই মাটি আস্তে আস্তে গলে ধুয়ে যায়। গোরুর গাড়ি ছাড়া এ রাস্তায় কিছু চলে না।

যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স উনিশ আর ছোট-মামার বয়স পঁয়তিরিশ। ছোটমামার ছিপছিপে লম্বা চেহারা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, সাদা ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া কক্ষণো কিছু পরতেন না। অদ্ভুত বইয়ের নেশা। ঠিক পছন্দমত বই পেলে তা নিয়ে ছোটমামা সারাদিন ভুলে থাকতে পারেন। আর জানোয়ারের বই হলেত কথাই নেই। নাওয়া খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।

সে দিনটার কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না।

মুর্শিদাবাদ জেলার সালার নামে এক রেল স্টেশনে নেমে আমরা ছ'জনে যাচ্ছিলাম সাত মাইল দূরে এক নবাব বাড়িতে। আসল নবাব নয়, তাদেরই হয়তো দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়। কিংবা অনেক ছোট খাটো মুসলমান জমিদারদেরও লোকে নবাব

বলতো। যেমন অনেক হিন্দু জমিদারের বাড়িকেই লোকে বলতো রাজবাড়ি।

এই নবাব বাড়িতে অনেক পুরোনো বই আছে শুনেছিলাম। আগেকার দিনে নবাবরা চিতাবাঘ-টিতাবাঘ পুষত, তাই ছোটমামার বিশ্বাস এ বাড়িতেও জানোয়ারের বই থাকা আশ্চর্য নয়। আমরা যাচ্ছিলাম সেই বই-এর খোঁজে।

গোরুর গাড়ি ছাড়া এই সাত মাইল পথ যাবার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্তত তখন ছিল না। গোরুর গাড়িটা আমার খুব পছন্দ নয়। ছোটমামাও বলেছিলেন, ফেরার সময় বই পত্র নিয়ে তো গোরুর গাড়িতে আসতেই হবে, চল, এখন হেঁটে যাই।

পথের মধ্যে সেই কুকুর। গ্রামের রাস্তায় এরকম একটা দুটো কুকুর তো থাকবেই। ছোট মামাকে নিয়ে বাইরে বেরুনোর এই এক মুস্কিল।

ছোট মামা যেমন কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছেন কুকুরটাও সেই রকম আমাদের দেখে ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ছোটমামা বললেন, নীলু, কুকুরটাকে তাড়া!

আমি বললাম, ও কিচ্ছু করবে না! আমরা এগোলেই ও সরে যাবে।

উঁহুঁ! পাগলা কুকুর হতে পারে। দেখছিস না, ল্যাজ ঝোলা?

—ভয় পেলে সব কুকুরেরই ল্যাজ ঝুলে যায়।

—জিভ বার করে আছে।

—হাঁপিয়ে গেছে বোধ হয়। কুকুর জিভ বার করে দম নেয়।

কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়, জানিস। নেড়ি কুত্তা কামড়ালেও হয় বুল ডগ কামড়ালেও হয়।

কুকুরের ব্যাপারে আমিও যে খুব একটা সাহসী তা নয়। অনেক জায়গায় খুব বড় সাইজের অ্যালসেশিয়ান, গ্রেট ডেন বা

ডবারম্যান জাতীয় কুকুর দেখলে আমারও বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু একটা রোগা নেড়ি কুত্তা, খুব কাছে এলে ওকে তো একটা লাথি মেরেও হঠিয়ে দিতে পারবো।

আমি বললাম, এই যা, যাঃ!

কুকুরটা খুব আস্তে ঘেউ করে উঠলো। সেটা ঠিক রাগের ডাক নয়, যেন ভয়ে ভয়ে কোনো অনুরোধ জানাচ্ছে।

ছোটমামা বললেন, দেখলি! রাস্তা ছেড়ে যাবে না।

আমি বললাম, ও এদিকেই আসতে চায়।

আকাশে কালো মেঘ। রাস্তার দু'পাশের ধান ক্ষেতে খুব গাঢ় সবুজ রংও পাল্টে গেছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে, আমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ছোটমামার কাছে ছাতা আছে, কিন্তু এই রকম ফাঁকা জায়গায় ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে ছাতায় কোনো কাজ হয় না।

কুকুরটা আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। খুব সম্ভবত সে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু ওকে এগোতে দেখেই ছোটমামা রাস্তার বাঁ দিকের ঢালু জায়গাটা দিয়ে দৌড়ে খানিকটা নীচে নেমে গেলেন।

কত ছোটখাটো ঘটনা থেকে বিরাট কাণ্ড হয়ে যায়। সেদিন ছোটমামা রাস্তাটার বাঁ দিকে না নেমে যদি ডান দিকে নামতেন, তা হলে তাঁর জীবনটা এরকম সাঙ্ঘাতিক ভাবে বদলে যেত না। কিছুই হতো না।

ছোটমামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নীচে নেমে এলাম। ভাবলাম, কুকুরটা এবার পার হয়ে যাবে। কিন্তু কুকুরটাও নেমে এলে বাঁ দিকের ঢালু ধার দিয়ে। খানিকটা দূরত্ব রেগে গর-র-র গর-র-র আওয়াজ করতে লাগলো।

ছোটমামা বললেন বলেছিলাম না পাগলা কুকুর। খবর্দার, দৌড়াবার চেষ্টা করিস না।

আমার তখনও কুকুরটাকে পাগলা বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ কুকুরটার মুখ চোখে রাগের ভাব নেই। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু সেটাও বেশ নরমভাবে।

আমরা দু'জনে কুকুরটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের পেছন দিকে একটা ঝোপ। সামনে খানিক দূরে একটা নোংরা জলের ডোবা। কাছাকাছি কোনো বাড়ি ঘর বা মানুষজন নেই।

কুকুরটা সেইরকম আওয়াজ করতে করতে এক পা এক পা করে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো। ছোটমামা ছাতাটা বাগিয়ে ধরলেন। আমি হুস, হাস, এই, যাঃ বলতে লাগলাম।

খুব ভীতু লোকরাও এক সময় খুব সাহসী হয়ে ওঠে। কুকুরটা আর একটু কাছাকাছি আসতেই ছোটমামা নিজে দু'পা এগিয়ে ছাতাটা দিয়ে ওর পিঠে খুব জোরে এক ঘা কষালেন।

কুকুরটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলো। কিন্তু উল্টে আমাদের আক্রমণ না করে সে পেছন ফিরে প্রাণপণে দৌড় মারলো।

ছোটমামা বীরের মতন বললেন, দেখলি? ব্যাটাকে দিয়েছি ঠাণ্ডা করে।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। কুকুরটা খুব জোরে পালাতে গিয়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো সেই ডোবাটার মধ্যে। জলের মধ্যে দাপাদাপি করলো একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল আবার। কুকুরটা ঘাড় কাৎ করে ভাসছে, আর তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, মরে গেছে!

আমরা হতবাক। কুকুর কক্ষনো জলে ডোবে না, সব জন্তু-

জানোয়ারই জন্ম থেকে সাঁতারু। তা হলে কুকুরটা মরে গেল কেন? তা হলে কি ছোটমামার ছাতার ঘা খেয়েই মরে গেল? কিন্তু সব নেড়ি কুত্তাই খুব মারধোর খায়, এক ঘা ছাতার বাড়ি খেয়ে তার তো কিছু হবার কথা নয়।

আমরা ডোবাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। কুকুরটা যে মরে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোটমামা আর আমি চোখাচোখি করলাম কয়েকবার, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছোটমামার নরম মন, তাঁর মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। তিনি কুকুরটাকে মেরে ফেলতে চান নি মোটেই।

এমন হতে পারে যে কুকুরটা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। ও যে-কোনো সময় মরতে পারতো। ছাতার ঘা খেয়ে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল করেছে।

এই সময় কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে আমরা আবার চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। ঝোপটার আড়াল থেকে তুরতুরে পায়ে বেরিয়ে আসছে তিন চারটে কুকুর ছানা। তখন সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ কুকুরটা আমাদের তাড়া করে আসেনি। ও ওর বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইছিল। আমরাই বা সেটা বুঝবো কী করে? সব কুকুরকেই আমরা কুকুর বলি, কিন্তু ওটা ছিল কুকুরী। ছানাগুলো ঘুমোচ্ছিল বোধহয়, আওয়াজ শুনে জেগে উঠেছে।

আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা মরে গেল, এখন বাচ্চাগুলোর কী হবে? আমরাই বা এখন কী করবো? নবাব বাড়িতে যাচ্ছি, সেখানে তো আর কয়েকটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা কোলে করে যাওয়া যায় না।

এমন সময় টপাটপ ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে বাজ ডাকলো একবার। ছোটমামা বললেন, চল এবার। ওরা ঠিক বেঁচে যাবে। একমত হয়ে আমিও উঠে এলাম রাস্তার

ওপরে মনে হলো যেম মরা কুকুরীটা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

খানিকটা যেতে না যেতেই সুরু হলো ঝড়। আকাশের এদিক থেকে ওদিক চিরে যেতে লাগলো বিদ্যুতে। আর কী অসম্ভব জোর বজ্রের আওয়াজ ফাঁকা মাঠের মধ্যে এই আওয়াজ যে কত সাজ্ঘাতিক তা সেদিনেই বুঝেছিলাম। মনে হয় যেন একটা বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে।

হাঁটবার বদলে আমরা প্রায় দৌড়োতো শুরু করেছি। রাস্তার ধারে একটা খেজুর গাছ দেখে ছোটমামা বললেন, আয়, এখানে একটু দাঁড়াই। আমি বললাম, না, এখনো জোরে বৃষ্টি নামেনি, কোন গ্রাম-ট্রাম পাওয়া যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জোরে একটা বাজ পড়লো। আমি চোখ বুজে কান ঢেকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু পরে চোখ মেলে দেখি, ছোটমামা খেজুর গাছটার কাছেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। আর গাছটার রং হয়ে গেছে কালো।

আমার বুকের মধ্যেও যেন একটা বাজ ডেকে উঠলো। বজ্রপাতে মানুষ মরে যাবার কথা শুনেছি। তবে কী তাই হলো ছুটে গেলাম ছোটমামার কাছে, পিঠে হাত রেখে বললাম! ছোটমামা!

ছোটমামা চোখ মেলে বললেন, কী?

আমি একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেললাম। আমার মাথায় যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগলো। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি!

—ছোটমামা, তোমার কিছু হয় নি তো?

—না তো! আমি রাস্তায় শুয়ে আছি কেন?

—পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলে বোধহয়? উঠতে পারবে?

—হ্যাঁ, কেন পারবো না!

ছোটমামা নিজে উঠে দাঁড়ালেন। ছাতাটা ছিটকে এক পাশে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নিলাম। আমার জন্য অপেক্ষায় না করেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন ছোটমামা। আমি এগিয়ে গিয়ে দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম, ছোটমামা কোনো উত্তর দিলেন না। মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। ছোট মামার চোখে চশমা নেই। অথচ চশমা ছাড়া উনি ভালো দেখতেই পান না। হাঁটতে পর্য্যন্ত অসুবিধে হয়।

—ছোটমামা, তোমার চশমা ?

ভুরু কুঁচকে ছোটমামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, চশমা আমার চশমা ছিল, তাই না। সেটা কোথায় গেল ?

—আমি দেখছি !

দৌড়ে ফিরে গেলাম খেজুর গাছটার কাছে। একটু খুঁজতেই চশমাটা পাওয়া গেল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ছোটমামা, তোমার সত্যি কিছু হয় নি তো? শরীর ঠিক আছে।

কোনো উত্তর না দিয়ে আমার কাছ থেকে চশমাটা নিয়ে ছোট মামা আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

যে রকম মেঘ ডাকছিল, সেই তুলনায় জোর বৃষ্টি হলো না। আমরা সন্ধ্যের এক আগেই পৌঁছে গেলাম নবাব বাড়িতে।

সে বাড়ি দেখলে কান্না পায়। এক সময় নিশ্চয়ই দারুণ ব্যাপার ছিল, এখন অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে একটা ভগ্নস্তূপ। সিংহদ্বারের একটা সিংহ এখনো টিকে আছে, অন্যদিকে কিছুই নেই। কোথাও দাঁড়িয়ে শুধু একখানা দেয়াল, কোথাও একখানা দু'খানা ঘর আস্ত আছে, কিন্তু দরজা জানালা নেই। মনে হয়, সাত মহলা না হলেও তিন চার মহলা প্রসাদ ছিল। এখন

এই ভাঙা চুরো বাড়ির মধ্যেও কিন্তু অনেক লোক আছে। জোড়াতালি দিয়ে থাকে, কেউ এ বাড়ি সারাবার কথা চিন্তা করে না।

একটু খোঁজ করতেই নবাবকে পাওয়া গেল। বর্তমান নবাবের বয়স খুব কম। বাইশ তেইশ বছর মাত্র, নবাবী চাল কিছু নেই, প্যান্ট শার্ট পরা সাধারণ কলেজের ছাত্রদের মতন মনে হয়। বেশ হাসি খুশি। ছোটমামার কাছে হাইকোর্টের জজ ইউসুফ সাহেবের একটা চিঠি ছিল। সেটা দেখে তরুণ নবাব বললেন, বই পত্র সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, উইপোকায় শেষ করে দিয়েছে। আপনারা দেখে ইচ্ছে মতন যে-কটা খুশি নিতে পারেন। আমি শিগগির পাকাপাকিভাবে বিলেত চলে যাচ্ছি, তাই যা আছে সব বিলিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

গোটা একটা বাড়িতে নাকি ছিল লাইব্রেরি। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে বাড়িটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি ভেঙে যায় নি। দু' তিনখানা ঘর এখনো প্রায় আস্তই আছে। একটা ঘরে ঢুকে দেখলাম, বইপত্র একেবারে পাহাড় হয়ে আছে। খুব সম্ভবত আগে এ ঘরে বড় বড় আলমারি বা কাঠের র‍্যাক ছিল। কেউ একজন তার থেকে সব বইগুলো বার করে মেঝেতে ফেলে সেই আলমারি আর র‍্যাক বিক্রি করে দিয়েছে। অধিকাংশ বই-ই ছিঁড়ে কুটিকুটি।

ছোটমামা আন্দাজে ভুল করেনি। জানোয়ারের বই-ও বেরুল দুএকখানা। অতিকষ্টে গোটা চারেক বই আমরা বেছে নিতে পারলাম। বাকি আবার কাল সকালে দেখবো বলে বেরিয়ে এলাম। ধুলো আর ভ্যাপসা গন্ধ ভরা ঐ ঘরের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকলে দম আটকে আসে।

অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও নবাব বাড়ির আতিথ্য এখনো বেশ উঁচুদরের। ছোটমামার জামা কাপড়ে কাদা লেগে গিয়েছিল বলে

ওঁকে দেওয়া হলো একটা-সিল্কের লুঙ্গি আর একটা ভাঁজ ভাঙা পাঞ্জাবী। রাত্রে খাওয়া দাওয়াও জমলো বেশ, তিনরকম কাবাব আর ঘি চপচপে পরোটা। থাকার জন্য একটা ঘরও পাওয়া গেল। সেখানটায় একতালার সব ঘর আবর্জনায় ভর্তি, কিন্তু সিঁড়ি আর দোতলার একটা ঘর অটুট আছে। সেখানে পাশাপাশি দু'খানা খাটে পরিষ্কার চাদর পাতা। নবাব নিজে এসে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের খুবই অসুবিধে হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন বারবার। আমরা খুব না না বলতে লাগলুম। আমি একাই বেশী বললাম অবশ্য, ছোটমামা সেই বিকেলের পর থেকে কথা বলছেন খুব কম।

ইলেকট্রিসিটি নেই, একটা হারিকেন রাখা আছে আমাদের ঘরে। ছোটমামা সেই টিমটিমে আলোতেই একটা বই খুলে বসেছেন। কিছুক্ষণ বই না খুলে ছোটমামা ঘুমোবেন না আমি জানি। কিন্তু আমার ঘুম পেয়ে গেছে। আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে, আর সারারাত বৃষ্টি পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই, ঘুমটা জমবে ভালো। অবশ্য বেশী বৃষ্টি হলে এই বাড়িটা না ধ্বসে পড়ে!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে। এতরাত্রে এ রকম ইয়ার্কি কে করে? পাশ ফিরে দেখলাম নিজের খাটের উপর সোজা হয়ে বসে ছোটমামা এক মনে বই পড়ছেন।

—ছোটমামা কোনো আওয়াজ শুনেছো?

ছোটমামা শুধু আমার দিকে একবার তাকালেন। কোনো উত্তর দিলেন না। পড়ার সময় ডিসটার্ব করা পছন্দ করেন না ছোটমামা। আমি ভাবলাম, তা হলে ঘুমের মধ্যে নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি। পাতলা ঘুমের মধ্যে এরকম অনেক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়।

আবার চোখ বুজলাম। কিন্তু কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি।

খুব খারাপ গন্ধটা। অথচ একটু চেনা চেনা। যাই হোক, ঘুমোবার চেষ্টা করলাম জোর করে। গন্ধটা যেন বেড়েই যেতে লাগলো। এবার চিনতে পারলাম; ছোটমামার সঙ্গেই চিড়িয়াখানায় গেছি কয়েকবার, সেখানে বাঘ সিংহের খাঁচার সামনে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। সেই রকমই বোঁটকা গন্ধ। তখন মনে হলো, একটু আগে যে আওয়াজটা শুনেছিলাম, সেটাও যেন বাঘের ডাকের মতন।

তক্ষুনি আবার সেই রকম বাঘের ডাক শোনা গেল। একেবারে ঘরের মধ্যে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখলাম, সামনে খোলা বইখানির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছোটমামা আওয়াজ করছেন উম্ ম্মা! উম্ ম্মা! অবিকল বাঘের মতন। ঘরটাতে অসম্ভব গন্ধ।

ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলেও আমি ডাকলাম, ছোটমামা!

ছোটমামা ডাক থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন। একদম অন্যরকম মুখ। অসম্ভব হিংস্র। গলা দিয়ে গার-র-র আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ছোটমামার বদলে অন্য কোনো লোক হলে আমি কি করতাম জানি না। কিন্তু ইনি তো আমার নিজের ছোটমামা। খাট থেকে লাফিয়ে উঠে ছোটমামাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, ছোটমামা! ছোটমামা? কী হয়েছে? তোমার কী হয়েছে।

তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামার সামনের খোলা বইটাতে একটা বাঘের ছবি।

কিছু না ভেবেই আমি বইটা বন্ধ করে দিলাম।

ছোটমামা অমনি সাধারণ গলায় বললেন, কিছু হয়নি তো! তুই অমন করছিস কেন?

—তুমি ওরকম শব্দ করছিলে কেন? ঘরে কিসের গন্ধ?

—কই কিছু না তো! আমি তো গন্ধ পাচ্ছি না।

আমি ভয়ে ভয়ে খাটের তলা দেখলাম। কিন্তু দোতলার ওপর

নীচে তো বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে না। আওয়াজটা ছোটমামাকেই করতে দেখেছি। ছোটমামা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? না মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ছোটমামা হাই তুলে বললেন, আমিও এবার শুয়ে পড়বো।

হারিকেনটা কমিয়ে রাখা হলো খাটের পাশে। ছোটমামা একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁরে, নীলু, কুকুরটাকে কি আমি মেরে ফেললাম?

আমি বললাম না, না, অত সহজে কি কুকুর মরে?

—হয়তো আমার ছাতার ঘায়ে ওর শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল! তাই জলে পড়ে গিয়ে· ·· ··

—আমার তা মনে হয় না। ওর নিশ্চয়ই মরবার সময় হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ছোটমামা হুংকার দিয়ে বললেন, বেশ করেছি, মেরেছি! একটা পাগলা কুকুর তেড়ে এলে মারবো না?

আমার ছোটমামা বরাবর শান্ত স্বভাবের মানুষ। কোনোদিন এরকম দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলেন না। কিন্তু এ সবের চেয়েও আমি বাঘের ডাকটার কথা বেশী চিন্তা করছিলাম। ছোটমামা এরকম বাঘের মতন ডাকতে পারেন? কোনোদিন শুনিনি আগে। ছোটমামা আমায় ভয় দেখাতে চাইছিলেন। তা হলে বাঘের গায়ের বোঁটকা গন্ধটা আমি পেলাম কি করে? ওটা কি আমি মনে মনে কল্পনা করেছি! গন্ধটা এখনো ঘর থেকে যায়নি পুরোপুরি।

রাত্রে আর কিছু হলো না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমামা বললেন, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

আমি বাঘের প্রসঙ্গটা একটু তুলতে যেতেই ছোট মামা বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস! এই মুর্শিদাবাদে বাঘ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

একটু বেলা হতেই তরুণ নবাব এলেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে। চা খাবার পর বললেন, চলুন, বই দেখতে যাবেন না।

ছোটমামার কোনো উৎসাহ দেখলাম না। বইয়ের ঘরে ঢুকেও ছোটমামা চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা বই-ও ছুঁয়ে দেখলেন না। যে ছোটমামা বইয়ের পোকা, যাঁর জন্য এতদূরে আসা! আস্ত দেখে পঁচিশ তিরিশখানা বই বেছে নিয়ে বললাম, ব্যাস যথেষ্ট হয়েছে। কয়েকটা বাণ্ডিলে বেঁধে নিলাম বইগুলো।

ফেরার পথে আমরা এলাম গোরুর গাড়িতে। নবাবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম সেটাতে। বিদায় নেবার সময় ছোটমামা একটাও কথা বললেন না। আমার খুব লজ্জা করছিল।

আগের দিন যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল, সে জায়গাটা মনে ছিল আমার। রাস্তার ওপর থেকেই নীচের সেই ডোবাটা দেখা যায়। মরা কুকুরটা এখনো জলে ভাসছে। বাচ্চাগুলোকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমার পাশে তাকিয়ে দেখলাম, ছোটমামা চোখ বন্ধ করে আছেন। আর বিড় বিড় করে কী যেন বলছেন। ছোটমামার ব্যবহার দেখে আমি রীতিমতন চিন্তায় পড়ে গেছি। কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার দেখাতে হবে। সামান্য একটা কুকুরকে মারা নিয়ে কী যেন হয়ে গেল। তাও তো ইচ্ছে করে মারা হয়নি। কিংবা ঐ যে বাজের আওয়াজে ছোটমামার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, সেই জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু কুকুরটার জন্য এখানে দেরি না হলে বাজ পড়বার আগেই আমরা অনেকটা চলে যেতাম।

স্টেশনে এসে মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা পেয়ে গেলাম একটা ট্রেন। উঠে পড়লাম টিকিট কেটে। আমাদের কামরায় খুব বেশী ভিড় নেই। একটাই মাত্র জানলার ধারের সীট ছিল, সেটা ছোটমামাকে দিয়ে আমি বসলাম পাশে। ছোটমামা আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

আধঘণ্টাখানেক বাদে ছোটমামা আবার চোখ মেলে গা ঝাড়া

দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, অনেক-ক্ষণ বসে থাকতে হবে। দে তো একটা বই পড়ি।

আমি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের বাণ্ডিল খুলতে গেলাম। ছোটমামা অন্য একটা বাণ্ডিলের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওর থেকে তিন নম্বর বইটা দে।

একটা চওড়া মতন বই, জার্মান ভাষায় লেখা, ভেতরে অনেক জন্তু জানোয়ারের ছবি। বইটা ছোটমামার দিকে এগিয়ে দিলাম।

ছোটমামা বইটির মাঝখানের একটা পাতা উল্টেই চোখ বিস্ফারিত করে ফেললেন। একটা অদ্ভুত চিৎকার করে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কামরার মেঝেতে।

কামরার সবাই আমাদের দিকে তাকালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হল, ছোটমামা ?

ছোটমামা কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলেন। নকল কুকুরের ডাক নয়। ঠিক যেন একটা কুকুর ডাকছে।

বহুলোক ভিড় করে এলো আমাদের দিকে। ছোটমামা তখনও ডেকে চলেছেন। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে ঠাট্টা মনে করে হাসতে লাগলো। আমার যেন লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমি ঝুঁকে ছোটমামার হাত ধরে বললাম, কী হয়েছে, ছোটমামা, এরকম করছ কেন ?

ছোটমামা খ্যাঁক করে আমার হাত কামড়ে ধরলেন দারুণ জোরে। অন্য লোকেরা এসে তাড়াতাড়ি না ছাড়িয়ে দিলে ছোট-মামা বোধহয় আমার হাতের মাংসই তুলে নিতেন। আমাকে ছাড়বার পরই ছোটমামা অন্যদের কামড়াতে গেলেন, তখন সবাই ছোটমামাকে দমাদম করে মারতে শুরু করলো।

এ রকম অবস্থায় আমি জীবনে কখনো পড়িনি আমার কান্না পেয়ে গেল। আমার ছোটমামাকে অন্য লোকেরা মারছে। আমি

ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোটমামাকে আড়াল করে কাতর গলায় বললাম, ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।

ছোটমামা তখনই আবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে রে, নীলু! লোকগুলো এখন ক্ষেপে গেল কেন!

একজন লোক মাটিতে ওল্টানো বইটা তুলে এনে দিল আমার হাতে। খোলা পাতাটায় একটা কুকুরের ছবি।

অনেক লোক তখনও বলতে লাগলো, নামিয়ে দিন লোকটাকে নামিয়ে দিন। আমি হাত জোড় করে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলাম। ছোটমামা বারবার অসহায়ভাবে বলতে লাগলেন, লোকগুলো এত রাগ করছে কেন? কী হয়েছে?

আমার হাত থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমি সেখানে একটা রুমাল চাপা দিয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি। আপনি চোখ বুজে থাকুন।

আমাদের কাছাকাছি আর কোনো লোক বসলো না।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোলাম ভালোভাবেই। ট্রেনের দু'জন সহযাত্রী আমার প্রতি দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। বেশ শান্তভাবেই ট্যাক্সিতে উঠলেন ছোটমামা। এমন কি লোকদুটিকে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানালেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর আমাকে বললেন, বেশ ভালো লোক তো ওরা। এবার বেড়ানোটা তেমন ভালো হলো না, সকাল থেকে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল কেমন যেন।

আমি বললাম, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি বোধ হয়। বাড়ি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তুই ভালো বই এনেছিস তো। আমার আর কিছু দেখা হলো না।

—হ্যাঁ, ভালো বই আছে কয়েকটা।

—দেখি, দেতো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বইগুলো আড়াল করে বললাম, না এখন নয়, বাড়িতে গিয়ে দেখবে।

ছোটমামা আর জোর করলেন না। বললেন, সত্যি রে, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমরা তখন থাকি মোমিন্‌পুরের কাছে। ট্যাক্সিটা ময়দান পেরিয়ে খিদিরপুরে উঠেছে। সামনে অনেকগুলো গাড়ি। ট্যাক্সিটা চলছে খুব আস্তে আস্তে। হঠাৎ পাশেই একটা ডুমডুম্ আওয়াজ পেলাম। ছোটমামা চোখ বুজে ছিলেন। অমনি আবার চোখ মেলে খাড়া হয়ে বসলেন। আমি দেখলাম, আমাদের ট্যাক্সির পাশ দিয়ে একজন বাঁদর নাচওয়ালা চলেছে তুটো বাঁদর নিয়ে।

ছোটমামা মুখ দিয়ে তু'বার হুপ হুপ করে ঝট্ করে ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে গেলেন রাস্তায়। তারপর লাফাতে লাগলেন সেই বাঁদর তুটোর পাশে। আর অবিকল একটা গোদা বাঁদরের মতন দাঁত মুখ খিঁচোতে লাগলেন বাঁদর ওয়ালার দিকে।

একটা দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। কলকাতার রাস্তায় ভিড় জমতে এক মিনিটও দেরি হয় না। তা ছাড়া এমন দৃশ্য, একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা লোক বাঁদরের মতন শব্দ করছে আর লাফাচ্ছে।

ছোটমামাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিকই। তারপর তাঁর অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে। কোনো ডাক্তার তাঁর মধ্যে পাগলামির কোনো চিহ্ন খুঁজে পান নি। কিন্তু তাঁর পাগলামি দিন দিনই বাড়তে লাগলো। এমনিতে ছোটমামা খুব চমৎকার স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু কোনো জন্তু জানোয়ার দেখলে কিংবা বইতে কোনো জন্তু জানোয়ারের ছবি, এমনকি নামটা দেখলেও তিনি বদলে যান। অমনি সেই জন্তুটির লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে। কোনো ওষুধে কোনো কাজ হলো না।

শেষ পর্যন্ত ছোটমামাকে রাখা হলো মধুপুরের একটা ফাঁকা

বাড়িতে। সে বাড়িতে কোনো ছাগল বা বেড়ালও ঢুকতে দেওয়া হয় না। ছোটমামা সর্বক্ষণ অঙ্ক বা জ্যামিতির বই পড়েন। গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ। কারণ আমি দেখেছি বাংলা বা ইংরাজিতে এমন কোনো গল্পের বই নেই, সেখানে একবার না একবার কোনো না কোনো জন্তু জানোয়ারের উল্লেখ থাকে না। একবার একটা বইতে শুধু 'বিড়ালের মতন সতর্ক' এই লাইনটা পড়েই ছোটমামা বিড়াল ডাক ডাকতে শুরু করেছিলেন।

আমার মনে হয়, পশু সমাজের কোনো আলাদা ব্যবস্থা আছে। তারাই কোনো রহস্যময় উপায়ে ছোটমামার ওপরে এরকম প্রতিশোধ নিয়েছে। যদিও জানি, আমার এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য, মধুপুরে গিয়ে যে কেউ আমার ছোটমামাকে এখনো দেখে আসতে পারে।

আর একটা কথাও আমার প্রায়ই মনে হয়। সেদিন কেন সেই মাটির রাস্তাটার বাঁ দিকে না নেমে ডান দিকে নামলাম না আমরা ? তা হলেই তো সব ঠিকঠাক থাকতো।

ছোড়দির বড়দি

আমার ছোড়দি দিল্লী থেকে আসবে, আমি তাকে আনতে গিয়েছি হাওড়া স্টেশনে। ছোড়দি একাই আসছে। দিল্লীতে আমার বড়মামা থাকেন, তিনি ছোড়দিকে ট্রেনে তুলে দিয়েছেন।

ছোড়দির খুব সাহস, একা একা যে-কোনো জায়গায় যেতে ভয় পায় না। একবার ছোড়দিকে একটা চাকরির পরীক্ষার জন্য মাদ্রাজ যেতে হয়েছিল। তখন মা বলেছিলেন দাদাকেও সঙ্গে যেতে। কিন্তু ছোড়দি বলেছিল, কিচ্ছু দরকার নেই! আমি কি কচি খুকী যে আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে!

মা বলেছিলেন, ওমা, কোনো মেয়ে আবার একলা একলা দূরের রাস্তায় যায় নাকি?

ছোড়দি বলেছিল, আজকাল বাঙালী মেয়েরা একলা একলা প্লেন চালায়, তা জানো না? তোমাদের সময়কার মতন কি সবাই এখনো অত ভীতু আছে?

ছোড়দির দারুণ জেদ। শেষ পর্যন্ত ঠিক একলা একলা গেল। পরদিনই মাদ্রাজ মেলের দারুণ দুর্ঘটনার কথা শোনালো রেডিওতে। আমাদের বাড়ীতে তো কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলেন। দাদা আর বাবা ছোটাছোটি করতে লাগলেন খবর জানবার জন্য। শেষ পর্যন্ত দাদা প্লেনে করে চলে গেলেন মাদ্রাজ। তার পরদিনই মাদ্রাজ থেকে ছোড়দির টেলিগ্রাম এলো, ঠিক সময়েই চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি। চিন্তার কিছু নেই।

দুর্ঘটনা হয়েছিল মাদ্রাজ শহর থেকে সাত মাইল দূরে। ইঞ্জিন আর সামনের দিকের দুটো কামরা ভেঙে গিয়েছিল। ছোড়দির কিছু হয়নি। ছোড়দি মাথা ঠাণ্ডা রেখে ট্রেন থেকে

নেমেই কাছাকাছি একটা দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে সেই সাইকেল চালিয়ে চলে গিয়েছিল, চাকরির জায়গায় তখন সবাই ছোড়দিকে ধন্য ধন্য করেছিল।

মাদ্রাজে চাকরি পেয়েও ছোড়দি অবশ্য বেশীদিন সেই চাকরি করেনি। এক জায়গায় ওর মন টেঁকে না। ছোড়দি এখন চাকরি করে দিল্লীতে। চার মাস বাদে কলকাতায় বেড়াতে আসছে।

ট্রেন এক ঘণ্টা লেট, আমি প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল। কোথাও একটু বসবার জায়গা নেই। বসবার বেঞ্চিগুলোতে লোকেরা শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

তারপর একসময় প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ঝমঝমিয়ে ট্রেন এলো। লোকজনের ঠেলাঠেলি আর হইচই। আমি গিয়ে মেয়েদের কামরার সামনে দাঁড়ালাম।

মেয়েদের কামরায় ছোড়দি আর একজন বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। দিল্লী থেকে এত ফাঁকা এসেছে, বিশ্বাসই করা যায় না। ওরা দু'জনে নিশ্চয়ই খুব আরামে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছে।

ছোড়দি সেই বৃদ্ধা মহিলার হাত ধরে খুব সাবধানে তাঁকে নামতে সাহায্য করলেন। আমি ততক্ষণে ছোড়দির সুটকেশ-বেডিং নামিয়ে ফেললাম।

ছোড়দি আমাকে বললো, এই নীলু, এঁকে প্রণাম কর। ইনি আমার বড়দি।

আমি একটু অবাক্ হলাম। আমার একটাই মোটে দিদি। তাছাড়া, ছোড়দির যদি কোনো বড়দি থাকেন, তাহলে তিনি তো আমারও বড়দি হবেন। কিন্তু কোনোদিন এঁর কথা তো শুনিনি।

বৃদ্ধা মহিলার গায়ের রং টুকটুকে ফরসা, মাথার চুলগুলো ধপধপে সাদা। মুখে একটা মিষ্টি হাসি। ইনি নিশ্চয়ই খুব বড় পরিবারের কেউ। দু'জন খাকী পোশাকপরা লোক ওঁর জিনিস-

পত্তর নিতে এসেছে। ওঁর হাতে একটা সুন্দর কারুকার্য করা বেতের বাক্স, সেটা উনি কাউকে দিলেন না। নিশ্চয়ই ঐ বাক্সে ওঁর গয়নাটয়না আছে।

আমি ছোড়দির কথামত ওকে প্রণাম করলাম। উনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, বেঁচে থাকো, সাহসী হও!

তারপর উনি ছোড়দির দিকে ফিরে বললেন, তোমরা আমার সঙ্গেই চলো না। আমার জন্যে তো গাড়ি এসেছে।

আমিও বাবার অফিসের গাড়ি নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি সেই কথাটা বললাম। উনি তখন বললেন, আচ্ছা, তাহলে চলি!

ছোড়দিকে বললেন, যা বলেছি, সব মনে থাকবে তো?

ছোড়দি বললো, হ্যাঁ বড়দি, সব মনে থাকবে। আপনি আবার দিল্লী এলে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

গাড়িতে উঠেই ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করলাম, ছোড়দি, উনি কে?

ছোড়দি শুধু বললো, আমার বড়দি।

তারপরেই ছোড়দি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে নীলু, কেউটে সাপ কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, তুই জানিস।

আমি চমকে উঠলাম। প্রথমে মনে হলো ভুল শুনেছি। তাই জিজ্ঞেস করলাম, কি বললে।

ছোড়দি বললো, কেউটে সাপ।

—কেউটে সাপ। কি হবে।

—কিনবো। কিনে পুষবো!

—তুমি সাপ পুষবে।

ছোড়দি একগাল হেসে বললো, হ্যাঁ। খুব ভালো জিনিস!

আমার সন্দেহ হলো, ছোটদির বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কিংবা আমারই কান দুটো একেবারে খারাপ হয়ে গেছে নাকি? দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে আমি ঝাঁকাতে লাগলাম।

বাড়ি পৌঁছোবার পর মা ছোড়দিকে জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তায় খাবার টাবার ঠিক মতন পেয়েছিলি তো। কোনো অসুবিধে হয়নি।

ছোড়দি বললো, না, মা, কোনো অসুবিধে হয়নি। তবে মোগলসরাই পর্যন্ত গাড়িতে বড্ড ভিড় ছিল। তারপর থেকে অবশ্য গাড়ি একদম ফাঁকা।

— মোগলসরাইতেই সবাই নেমে গেল ?

ছোড়দি মুচকি হেসে বললো. নামবে না কেন। গাড়িতে ডাকাত পড়েছিল যে !

মা একেবারে আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, কি বললি। গাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। কি সর্বনাশের কথা ! তুই তখন কি করলি।

ছোড়দি বললো, আমার তো ভয়ের কিছু ছিল না ! আমার সঙ্গে যে বড়দি ছিল।

—বড়দি আবার কে রে। সেই-বা ডাকাতদের সঙ্গে কি করলো।

—বড়দিই তো ডাকাতদের তাড়িয়ে দিল।

ছোড়দির বড়দিকে তো আমি দেখেছি। অন্ততঃ সত্তর বছরের বুড়ী। তিনি আবার কি করে ডাকাত তাড়াবেন।

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, মা, ছোড়দি আজ বড্ড উলটো-পালটা কথা বলছে।

ছোড়দি তখন হাসতে হাসতে বললো, বলছি, বলছি, সব বুঝিয়ে বলছি। খাবার-টাবার দাও, খিদে পেয়েছে যে। ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে আসি।

খাবার টেবিলে সবাই ছোড়দিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। পাশের বাড়ি থেকে এসেছে ছোড়দির বন্ধু খুকুদি আর মীনুদি। বউদি আর থাকতে না পেরে বললো, কি হয়েছিল, বলো না ছোটন। সত্যি সত্যি ডাকাত।

চায়ের চুমুক দিয়ে ছোড়দি বললো, একজনের হাতে পিস্তল ছিল, আর একজনের হাতে ছোরা। ছোরা-হাতে লোকটার মুখ ভরতি দাড়ি!

সবাই ভয়ে শব্দ করে উঠলো।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কি করলো মুখপোড়া ডাকাতগুলো? গভর্নমেণ্ট কিছু করতে পারে না এদের? লোকে কি রেলে চাপবে না।

ছোড়দি বললো, আমার আর কোনদিন ডাকাতের ভয় হবে না।

খুকুদি বিরক্ত হয়ে বললো, বাবারে বাবা! ছোটনটা কোন কথাই খুলে বলে না। আগে বল্ না, বড়দি কে?

ছোড়দি বললো, বড়দি যে-সে কেউ নয়। আসামের এক রাজার কাকীমা। এত বয়সেও কি সুন্দর দেখতে। বাংলা তো ভালো জানেনই, ইংরেজি, হিন্দী, ফরাসী—অনেক ভাষা জানেন। একা একা সারা দেশ ঘুরে বেড়ান, বিলেত-টিলেতেও একা এব গেছেন। একটুও ভয় পান না।

মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর সঙ্গে আগে আলাপ ছিল?

ছোড়দি বললো, না, এবারেই আলাপ হলো। ভাগ্যিস আমি ঠিক ওঁর পাশে গিয়ে বসেছিলাম। উনি প্রথমে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন নি—বারবার আমার দিকে শুধু তাকিয়ে দেখ-ছিলেন। তারপর একবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দিনের বেলা ঘুমোও।

আমি বললাম, কেন বলুন তো।

উনি বললেন, যারা ট্রেনে উঠে দিনের বেলায় ঘুমোয়, তাদের আমার ভালো লাগে না।

আমি তখন হেসে বললুম, না, আমি দিনের বেলা ঘুমোই না।

উনি তখন খুশী হয়ে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করতে লাগলেন। খুব চমৎকার গল্প বলতে পারেন উনি। সেই গল্প শুনতে শুনতে কি করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

মীনুদি বললো, কি গল্প বললেন, দু'একটা গল্প বল না আমাদের—

বউদি বললো, না না, সেই ডাকাতের কথা বলো। ডাকাতরা কখন এলো।

ছোড়দি বললো, আচ্ছা, বড়দির গল্পগুলো পরে এক সময় বলবো। এখন ডাকাতদের কথাই বলে নিই। আমাদের মেয়ে-কামরায় আট দশজন মেয়ে ছিল মোটে, বাকী সবাই পুরুষ।

বউদি বললো, ওমা, মেয়ে-কামরায় পুরুষরা ওঠে নাকি।

ছোড়দি বললো, অনেকদিন তো ট্রেনে চাপোনি, তাই কিচ্ছু জানো না। আজকাল আর নিয়মকানুন কেউ মানে না। আমি একবার একজন টিকিট চেকারকে ডেকে বলেছিলুম, এতগুলো লোক এখানে উঠেছে কেন, এদের নামিয়ে দিন না। তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি কি করবো বলুন, এদের তো অনেকের টিকিটই নেই।

বড়দি বললেন, দিনের বেলা থাকতে চায় থাক, রাত্তির হলেই আমি ওদের নামিয়ে দেবো।

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, বড়দি, আপনার কথা ওরা শুনবেই না।

বড়দি বললেন, শুনবে না কেন। ভালো করে বললেই শুনবে। অনেক পুরুষমানুষেরই নাক ডাকে। রাত্তিরে নাক-ডাকা শুনলে আমার একটুও ঘুম হয় না বলে আমি পুরুষদের কামরায় উঠি না।

দেখতে দেখতে রাত্তির হয়ে গেল। বড়দি তখন নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে রাজরানীর মতন হুকুমের সুরে সব কটা ছেলেকে বললেন, এই, তোমরা এবার নেমে যাও। অনেকক্ষণ তোমাদের বসতে দিয়েছি।

যেন পুরো রেলটাই বড়দির নিজের। কাকে কখন কোথায় বসতে দেবেন, সেটা ওঁর ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করছে।

আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু, বড়দির কথা শুনে অনেকেই সুড়সুড়

করে নেমে গেল। কেউ একটু তর্ক পর্যন্ত করলো না। ওদের মধ্যে দুজন বাঙালী ছেলে ছিল—আমি ভেবেছিলাম, বাঙালী যখন তর্ক করবেই। তারাও নেমে গেল মুখ বুজে।

শুধু তিনজন লোক খুব কাঁচুমাচুভাবে বড়দিকে বললো, আমরা আর দু' স্টেশন পরেই নেমে যাবো—আমাদের একটু বসতে দিন। ট্রেনে আর কোথাও একটুও জায়গা নেই।

বড়দি বললেন, ঠিক তো।

তারা জিভ কেটে বললো, নিশ্চয়ই।

এরপর আর একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। বড়দি নিজের শোবার জায়গাটায়গা ঠিক করলেন। একটা সুন্দর ছোট বেতের তৈরি গয়নার বাক্স রাখলেন মাথার কাছে। তারপর আমাকে বললেন, আমার জিনিসপত্তর একটু দেখো, আমি বাথরুম থেকে আসছি।

বড়দি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই পার হয়ে গেল দ্বিতীয় স্টেশন। বড়দি ফিরে এসে নিজের জায়গায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। কড়া গলায় সেই লোক তিনটিকে বললেন, এই, তোমরা নেমে গেলে না যে।

লোক তিনটি ওঠে দাঁড়ালো……

বউদি বললো, ওরাই বুঝি ডাকাত?

খুকুদি বললো, বউদি থামো। ওকে বলতে দাও—

ছোড়দি বললো, হ্যাঁ, ওরাই ডাকাত। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমরা তো স্টেশনে নামি না। চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াই আমাদের অভ্যেস। তার আগে যার কাছে যা আছে বার করুন তো!

ডাকাত তিনটে পিস্তল আর ছোরা উঁচিয়ে ধরতেই কামরার অন্য মেয়েরা চিৎকার আর কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমারও বুকের মধ্যে ধাপুস ধুপুস করছিল। কিন্তু বড়দির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। বড়দি আমাকে বললেন, ভয় নেই, চুপ করে বসে থাকো। তারপর আমার কানে কানে আর একটা কথা বলে দিলেন।

সব মেয়েরা তাদের গয়নাগাঁটি, টাকা-পয়সা দিয়ে দিল। একজন মহিলা তাঁর গলার হারটা কিছুতেই দিতে চাচ্ছিলেন না। কান্না-কাটি করছিলেন। দাড়িওলা ডাকাতটা সেটা ছিঁড়ে নিল গলা থেকে।

তারপর তারা এলো আমাদের সামনে। যার চেহারা সর্দারের মতন, সেই ডাকাতটা বললো, এই যে দিদিমা, যা আছে, সব দিন!

বড়দি বললেন, আমি কারুর দিদিমা নই!

ডাকাতটা বললো দিদিমা বা ঠাকুমা যাই হন, গয়নাগাঁটিগুলো চটপট বার করুন তো!

বড়দি আমার দিকে ফিরে বললেন, আজকালকার ডাকাতগুলো কি অসভ্য! মেয়েদের দিকেও ছুরি ছোরা তোলে। আগেকার দিনে কত ভালো ভালো ডাকাত ছিল। আমাদের বাড়িতে কতবার ডাকাত পড়েছে—কোনোদিন তারা মেয়েদের ভয় দেখায়নি। রঘু ডাকাতের ছেলে মধু ডাকাত একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল ডাকাতি করতে। কি ভালো ছেলে! আমার সামনে হাত জোড় করে বলেছিল, মা জননী……।

ডাকাত তিনটে বললো, আঃ, আমাদের এখন গল্প শোনার সময় নেই, কোথায় কি আছে দেখি।

বড়দি বললেন, ঠিক আছে বাপু, দাঁড়াও! খবরদার গায়ে হাতটাত দেবে না। আমার সব গয়না এই বেতের বাক্সে রয়েছে। আমি খুলে দিচ্ছি।

বড়দি বেতের বাক্সটা খুললেন, আর ডাকাত তিনটে ব্যস্তভাবে মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালো। বাক্সের ডালা খুলতেই ভেতর থেকে ফোঁস করে মাথা তুললো একটা মস্ত বড় কেউটে সাপ!

মা, বউদি, খুকুদি, মীনুদি, আমি—সবাই মিলে এক সঙ্গে বললাম, স্প্রিং-এর সাপ?

ছোড়দি বললো, স্প্রিং-এর সাপ আবার কি? সে তো সিনেমায় থাকে। এটা সত্যি সত্যি একটা বিরাট কেউটে, এত বড় ফণা।

ডাকাত তিনটে বাপরে বলে তিনপা পেছিয়ে গেল। সাপটা তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে লাগলো।

বড়দি তাঁর হাতব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বাঁশি বার করে ফুঁ দিতেই সাপটা বাক্স থেকে বেরিয়ে সরসর করে নেমে পড়লো। তারপর তাড়া করে গেল ডাকাতদের দিকে।

ডাকাত তিনটে হঠাৎ সাপটাকে দেখে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে কি করবে ভেবে পায়নি। তার আগেই সাপটা সবচেয়ে বড় ডাকাতটার একটা পা পেঁচিয়ে ধরে ফণা তুলে রইলো।

বড়দি বললেন, এবার আমি আর একবার বাঁশি বাজালেই সাপটা ছোবল বসাবে। বাজাবো?

ডাকাতটা হাউমাউ করে কেঁদে বললো, আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান!

বড়দি বললেন, কিন্তু আমার যে খুব বাজাতে ইচ্ছে করছে!

তিনটে ডাকাতই তখন হাত থেকে গয়নাটয়না আর টাকা-পয়সা ছুড়ে ফেলে দিল। বললো, আমরা নাকে খত দিচ্ছি!

বড়দি তখন আদর করে ডাকলেন, কেউটে সোনা, ওকে ছেড়ে দিয়ে একটু সরে এসো তো!

কেউটে সাপটা সত্যি লক্ষ্মী ছেলের মতন বড়দির কথা শুনলো। ডাকাতটাকে ছেড়ে একটু দূরে এসে ফণা তুলে রইলো।

বড়দি বললেন, আমার সঙ্গে আর একটা গোখরো সাপ আছে। তাও তো সেটাকে এখনো ছাড়িনি। সেটা বড্ড রাগী! দেশে দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই। আমি সব সময় সেইজন্য পোষা সাপ দুটোকে সঙ্গে রাখি।

বড়দি ডাকাত তিনটেকে সত্যি নাকে খত দেওয়াতেন। কিন্তু ট্রেন একটু আস্তে হতেই ডাকাত তিনটে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে পালালো।

পরের স্টেশনে অন্য সব মেয়েরাও নেমে গেল। তারা বড়দিকে ধন্যবাদ জানালো বটে কিন্তু সাপের সঙ্গে এক কামরায় থাকতে

চাইলো না। আমি আর বড়দি আরাম করে শুয়ে শুয়ে এলাম। বড়দি আমাকে শেখাতে লাগলেন, কি করে সাপ পুষতে হয়? ভালো করে শেখালে পোষা সাপ কুকুরের চেয়েও বেশী কথা শোনে।

গল্প শেষ করার পর সবাই বলতে লাগলো, তারা একদিন ছোড়দির বড়দিকে দেখতে যাবে। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, ছোড়দি, সাপ দেখে তোমার একটুও ভয় করেনি?

ছোড়দি বললো, ভয় করবে কেন? বড়দি যে আগেই আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, সাপ দুটোর বিষ দাঁত ভাঙা। বিষ দাঁত থাকলে পোষা সাপকেও কেউ বিশ্বাস করে না!

ইচ্ছাশক্তি

প্রথমে কেউই বিশ্বাস করেনি। ন' বছরের মেয়ে রুপালি সকালবেলা বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এল অসম্ভব চিৎকার করতে-করতে। সে দারুণ ভয় পেয়েছে, চোখ দুটো উঠে গেছে প্রায় কপালে, কোনো কথাই বলতে পারছে না, শুধু শব্দ করছে আঁ-আঁ-আঁ!

তার ছোট কাকা তাকে প্রথম দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কী হল? এই রুপু, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?"

রুপালি বাথরুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

গোলমাল শুনে আরও অনেকে বেরিয়ে এসেছে। রুপালির দিদি সোনালি আর দাদা হীরক।

"কী হয়েছে বাথরুমে? কথা বলছিস না কেন?"

রুপালি তখন কোনোক্রমে বলল, 'বাথরুমে বা-বা-বা-বা!"

রুপালি মাঝে-মাঝেই ভূত দেখে। সন্ধের পর একলা কোনো ঘরে এক মিনিটও থাকতে পারে না। এক বছর আগে রুপালিদের বাবা হঠাৎই মারা গেছেন। রুপালির বা-বা-বা-বা শুনে সবাই ভাবল সে বুঝি তার বাবাকে দেখেছে। কিন্তু দিনের বেলা কি কেউ ভূত দেখে।

হীরক সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে, সে ওসব কিছুতে বিশ্বাস করে না, আর তার খুব সাহস। সে রুপালিকে ধমক দিয়ে বলল "আজ পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে কি না, তাই এসব ন্যাকামি করেছিস।"

তারপর হীরক বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতেই রুপালিকা থামিয়ে বলল, "দাদা, যেও না! বাথরুমে বাঘ!"

অমনি বাথরুমের টিনের দরজায় দড়াম করে একটা খুব জোর শব্দ হল।

হীরক ছাড়া আর সবাই হুড়মুড় করে দৌড়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। শিলচর শহরে বাঘ আসবে কোথা থেকে? এদিকে এখন কোনো সার্কাসের দলও আসেনি যে, তাদের কাছ থেকে কোনো বাঘ পালিয়ে আসবে। তবু বাঘের নাম শুনলেই ভয় হয়।

হীরক চেঁচিয়ে বলল, "একটা লাঠি দেখি। ছোটকাকা একটা লাঠি নিয়ে এস।"

ছোটকাকা বললেন, "পালিয়ে আয়, হীরক। আমি থানায় খবর দিচ্ছি।"

হীরকের মা দোতলায় পুজোর ঘরে ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এসে ভয়-পাওয়া গলায় বলতে লাগলেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

বাথরুমের দরজায় আবার দড়াম করে আওয়াজ হল। কোনো একটা বড় জন্তু যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু দরজা খুলতে পারছে না।

এবার হীরকও খানিকটা পিছিয়ে এল। ছোটকাকা তার হাত ধরে বাড়ির মধ্যে টেনে আনলেন।

রুপালি বলল,-"আমি দেখলাম, বাথরুমের মধ্যে আগুনের মতন জ্বলজ্বলে চোখ…"

ছোটকাকা বললেন, "আমাদের ছেলেবেলায় আমরা অনেক বাঘ দেখেছি…আসামে একসময় অনেক বাঘ, ভাল্লুক আর গণ্ডার ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিলিটারিরা মেশিনগানের গুলি দিয়ে কত মেরেছে—এখনো কিছু-কিছু আছে।"

হীরক বলল, "তা বলে শিলচরে বাঘ আসবে কী করে? এখানে জঙ্গল কোথায়?"

বাড়িসুদ্ধু সবাই চ্যাচাঁচ্ছে, তাই শুনে পাড়ার অনেক লোক 'কী হল' 'কী হল' বলে ছুটে এল। ছোটকাকা থানায় ফোন করে দিলেন। কাছেই থাকেন বঙ্কুবাবু, তিনি এক সময় চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন, তাঁর বাড়িতে বন্দুক আছে। কেউ

একজন চেঁচিয়ে বললেন, "ও বঙ্কুবাবু, আপনার বন্দুকটা একবার নিয়ে আসুন।"

বঙ্কুবাবু বললেন, "বন্দুক আছে, কিন্তু গুলি যে নেই, অনেক দিন ব্যবহার করিনি··· ।"

হীরকের কয়েকজন বন্ধুও এসে জুটেছে, তাদের হাতে লাঠি। তারা সাহস করে এগোতে যাচ্ছিল, ছোটকাকা বললেন, "তোরা কি পাগল হয়েছিস? বাঘের সঙ্গে খালি হাতে লড়া যায়?"

রুপালিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ঠিক দেখেছিস বাঘ? কত বড়?"

রুপালি বলল, "শুধু মাথাটা দেখেছি, এই অ্যাতো বড়!"

রুপালি দু' হাত ফাঁক করে যা দেখাল, তত বড় মাথা কোনো বাঘ তো দূরের কথা, হাতিরও হয় না।

হীরক বলল, "কুকুর-টুকুর দেখিসনি তো? সরকারদের বাড়ির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাই তো নেকড়ে বাঘের মতন। হয়তো ভুল করে ঢুকে পড়েছে—"

বাথরুমের দরজায় আবার শব্দ। দরজাটা বাইরে থেকে ঠেললে খোলে। জন্তুটা ভেতর থেকে ঠেলছে বলে খুলতে পারছে না।

হীরক বলল, "একটা লম্বা বাঁশ এনে দূর থেকে দরজাটা ঠেলে খুললে হয় না?"

ছোটকাকা বললেন, "যদি সত্যি বাঘ হয়,...বাঘ কত দূর লাফাতে পারে জানিস? একজনকে মারবেই!"

এই সময় যেন আপনা-আপনিই খুলে গেল দরজাটা। আর কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু দরজাটা খুলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না।

তারপর খানিকক্ষণের মধ্যেও কিছুই বেরুল না দেখে গুনগুন

ফিসফাস শুরু হয়ে গেল আবার। হীরক বলল, "কী ব্যাপার, ওর মধ্যে সত্যিই কি কিছু আছে? একবার দেখা দরকার!"

হীরকের বন্ধু মাণিক বলল, "বোধহয় ইঁদুর-টিঁদুরে শব্দ করছে।"

ঠিক তক্ষুনি বাথরুমের ভেতর থেকে বড়-মতন কী যেন একটা জানোয়ার এক লাফে বেরিয়ে এল বাইরে। সবাই এমন হুড়মুড়িয়ে ছুটল যে, এরপর আর কিছুই বোঝা গেল না। চায়ের দোকানে কাজ করে যে ছেলেটা, সে এমন চ্যাঁচাতে লাগল যে, মনে হল যেন তাকেই বাঘে কামড়েছে।

সবচেয়ে ভাল দেখতে পেল, যারা বাড়িগুলোর ছাদে উঠে ছিল। সেই জন্তুটা বাথরুম থেকে বেরিয়েই এক মুহূর্তও না দেরি করে সঙ্গে সঙ্গেই ডান দিকে ফিরে আবার দিল এক লাফ। তারপর ছোট পুকুরটার পাশ দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে আবার এক লাফে ঢুকে গেল পাশের ঝোপটার মধ্যে।

শুধু পুকুরের ধার দিয়ে দৌড়ে যাবার সময়টুকুতেই বোঝা গিয়েছিল সেটা সত্যিই একটা বাঘ। লাফাবার সময় সে যেন একটা বিদ্যুৎ। কেউ বলল সেটা চিতাবাঘ, কেউ বলল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। কেউ বলল তার হলুদ গায়ে কালো ছিটছিট; কেউ বলল, না, বড় বড় ডোরাকাটা। কেউ বলল, অত বড় বাঘ আগে জীবনে দেখেনি; কেউ বলল, না, তেমন বড় নয়, সরকারদের অ্যালসেশিয়ানের চেয়েও একটু ছোট।

ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সত্যিকারের একটা বাঘ শিলচর শহরে পুকুর-পাড়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। তাও রুপালির পরীক্ষার দিন সকালবেলা।

ততক্ষণে প্রায় হাজার-হাজার লোক জমে গেছে, সবাই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছে, কিন্তু কেউই ঝোপটার কাছে যেতে সাহস করছে না। আবার যারা নতুন লোক এসে ভিড় জমাতে লাগল, তারা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলে, "ধ্যুৎ, বাঘ না ছাই।" অন্যরা

অমনি হৈ-হৈ করে প্রতিবাদ করে ওঠে। তারা নিজের চক্ষে দেখেছে। শিলচর শহরে বাঘ আসা এমন কী অসম্ভব ব্যাপার, এখানে কাছাকাছি জঙ্গল না থাকলেও নর্থ কাছাড়ের পাহাড় তো খুব বেশি দূরে নয়।

এবার পুলিস এল। প্রথমে ছু'জন। কিন্তু ছু'জন পুলিস দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তাদের কাছে বন্দুকও নেই। তারা এসেছে ঘটনাটা সত্যি কিনা দেখতে। তারপর এল একগাড়ি পুলিস। সঙ্গে স্বয়ং এস পি সাহেব। তিনি ছু'জন রাইফেলধারী পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলেন পুকুরটার দিকে! তখন বুড়ো বঙ্কুবাবু, সেই যে যাঁর বাড়িতে বন্দুক আছে কিন্তু গুলি নেই, তিনি এস-পি-কে বললেন, "স্যার, আপনি কি বাঘটাকে গুলি করবেন নাকি? জানেন, আজকাল বাঘ মারা বে-আইনি? আজকাল বাঘদের অজ্ঞান করে ধরতে হয়!"

এস-পি সাহেব কটকট করে বঙ্কুবাবুর দিকে তাকালেন যেন উনি বাঘটার বদলে বঙ্কুবাবুকেই গুলি করবেন!

ঝোপটার মধ্যে বাঘটাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। দেখা না গেলে গুলি করা যাবে কী করে? তখন ঠিক হল, আগে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হবে। সেই টিয়ার গ্যাসের চোটে বাঘটা কাঁদতে-কাঁদতে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলেই গুলি করে মারা হবে তাকে। একজন পুলিস ছুটে গিয়ে টিয়ার গ্যাস শেল নিয়ে এল। হাজার-হাজার লোক পুলিসদের বড্ড কাছাকাছি এসে পড়েছে বলে এস পি সাহেব ১৪৪ ধারা জারি করে দিলেন, তবুও কেউ সরতে চায় না।

ফটফট করে ছুটো টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়া হল ঝোপটার ওপরে। তাতেও কিন্তু বাঘটা বেরুল না। বাতাসে টিয়ারগ্যাস ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকদের চোখ জ্বালা করে উঠল। বাড়ীগুলোর মধ্যেও ঢুকে গেল টিয়ারগ্যাস, মা-মাসি-পিসিরা রান্নাঘরে পেঁয়াজ কোটা কিংবা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দেবার সময় যতটা কাঁদেন, আজ তার চেয়েও বেশি কাঁদতে লাগলেন।

এর পর দমাদম করে ছোড়া হতে লাগল ইঁট। সাহস করে অনেকেই এগিয়ে গেল অনেকটা। অত ইঁট খেয়েও কোনো বাঘের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। একটু পরেই বোঝা গেল যে, ঐ ঝোপের মধ্যে বাঘটা নেই। যে-কোনো উপায়েই হোক, সেটা এর মধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে। ঝোপটার পেছনে কাঠের কারখানার উঁচু দেয়াল, বাঘটা যদি সেটা লাফিয়ে পার হবার চেষ্টা করত, এত লোকের চোখে সেটা পড়ত নিশ্চয়ই। একদল লোক হো হো করে হেসে উঠে বলল, "আগেই বলেছিলাম, বাঘ টাঘ কিছু নেই! স্রেফ গুল! সকালবেলায় বাঘ!"

এস-পি সাহেব ছোটকাকার দিকে কটমট করে তাকালেন। ছোটকাকা জোর দিয়ে বলে উঠলেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পুলিস এবং সমস্ত লোকজন চলে গেল কাঠের কারখানার ওপাশে। যেখানে প্রচুর খোঁজাখুজি হল। কিন্তু বাঘের টিকিটিরও পাত্তা নেই। বাঘটা যেন একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে

যাই হোক, এইসব করে তো সকাল নটা বেজে গেল। এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু রুপালির মনটা খুব খুশি-খুশি হয়ে আছে। বাথরুমের মধ্যে বাঘটা তাকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরলে খুবই খারাপ ব্যাপার-হত বটে, কিন্তু সেটা যখন হয়নি, তখন আর সব ভালই হয়েছে। এ রকম একটা ব্যাপার হল। আজ নিশ্চয়ই আর পরীক্ষা হবে না। কাল রাত্তিরে রুপালি অনেকক্ষণ ভগবানকে ডেকেছে, হে ঠাকুর তার যেন জ্বর হয়। অথবা পরীক্ষাটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। আজ ইংলিশ গ্রামার আর কমপোজিশান পরীক্ষা ছিল, ইংলিশ গ্রামারটা একটা বিচ্ছিরি জিনিস, কিছুতেই মুখস্থ হয় না।

কিন্তু এর পরেও হীরক এসে হুংকার দিয়ে বলল, "এই রুপু, তুই এখনো তৈরি হোসনি যে। পরীক্ষার সময় হয়ে যাচ্ছে না?"

রুপালি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। আজ আবার

পরীক্ষা হবে নাকি? শহরে বাঘ এলে পরীক্ষা হয়? তাহলে তো জঙ্গলেও গাছপালাদের পরীক্ষা হত। ইশ, বাঘটা কেন যে চলে গেল, আরও কিছুক্ষণ যদি থাকত।

হীরক কিছুতেই কিছু শুনল না। সে নিজে নিয়ে যাবে রুপালিকে। বেশ তো, পরীক্ষা হয় কি না, সেটা তো স্কুলে গেলেই জানা যাবে।

রূপালির মা বললেন, "রাস্তায় যদি বাঘটা আবার বেরিয়ে পড়ে?"

হীরক বলল, "ঐ তো পুঁচকে বাঘ, ওটা বেরোলেও কিছু যায় আসে না।"

স্কুলে এসে রুপালি দেখল যে, এখানে কেউ বাঘটার খবর জানেই না। আর দশ মিনিট বাদেই পরীক্ষা শুরু হবে। রুপালি তার ক্লাসের কয়েকজন বন্ধুকে বলল, "জানিস আমাদের পাড়ায় আজ একটা বাঘ এসেছিল।"

ক্লাসের বন্ধুরা খিলখিল করে হেসে উঠল। একটা মেয়ে বলল, "তোদের পাড়ায় বাঘ এসেছিল। আমাদের পাড়ায় এসেছিল সিংহ।" আর একজন বলল, "আমাদের পাড়ায় এসেছিল গণ্ডার।"

আর-একজন বলল, "আমাদের পাড়ায় হাতি!"

রুপালির মুখ শুকিয়ে গেল। আর যদি চার-পাঁচটা দিনও সময় পাওয়া যেত, তাহলে ইংলিশ গ্রামার মুখস্থ করে ফেলতে পারত। কেন যে গত সপ্তাহে হাইলাকান্দিতে ছোটমাসির বিয়েতে গিয়েছিল সে। চারদিন নষ্ট হল সেখানে। কিন্তু ছোট মাসির বিয়েতে কেউ না-গিয়ে পারে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তেই সবাই ঢুকে গেল ভেতরে। রুপালিদের ক্লাসরুমটা একতলার সিঁড়ির ঠিক পাশেই। দলের প্রথমেই ছিল রুপালি, সে দরজা দিয়ে ঢুকেই 'ওরে বাবা রে' বলে চিৎকার করে উঠল।

এবারেও কোনো চোখের ভুল নয়, রুপালিদের ক্লাসে টীচারের টেবিলের ওপরে বসে আছে বাঘটা। সবাইকে আরও বেশি বিশ্বাস করবার জন্যই যেন বাঘটা গ-র-র-হু-উ-উ-ম করে ডেকে উঠল।

তারপর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল। সবাই মিলে এক সঙ্গে ছুটতে গিয়ে মেয়েরা এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। দুটো মেয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল অন্য ক্লাসের মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে বেরোতে গিয়ে চেয়ার টেবিল উল্টে-পাল্টে দিয়ে ভাঙল। এরই মধ্যে বাঘটা ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে ল্যাজটা নাড়তে নাড়তে গ-র-র গ-র-র করতে লাগল, যেন সে এতগুলো মেয়ের মধ্যে কোন্ মেয়েটাকে খাবে, তা ঠিক করতে পারছে না।

রুপালিদের স্কুলের মোট একুশটি মেয়ে আহত হল সেদিন, যদিও বাঘটা কারুকেও ছোঁয়নি। বাঘটা এক সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে তিড়িং করে লাফ দিয়ে পড়েছিল বড় রাস্তায়। তারপর দেড় ঘণ্টা ধরে সে পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। পুলিসের একটাও গুলি তার গায়ে লাগেনি। তারপর বহুলোকের চোখের সামনে দিয়েই সে বরাক নদীর ওপরের ব্রিজ পেরিয়ে চলে গেল শিলচরের বাইরে। তারপর আর তার পাত্তা পাওয়া যায়নি।

শিলচর শহরে এত বড় ঘটনা বহুদিন ঘটেনি। রুপালিদের পরীক্ষা সাতদিন পিছিয়ে গেছে। যাতে আহত ছাত্রীরা সেরে উঠতে পারে।

সবাই এখনো জল্পনা করে যে, বাঘটা শিলচর শহরে কী করেই বা এসেছিল, কেনই বা এসেছিল! এত মানুষজন-ভরা জায়গায় তো বাঘ কখনো আসে না।

কিন্তু রুপালি জানে বাঘটা কেন এসেছিল। বাঘটা এসেছিল তার ইচ্ছাশক্তির টানে। সে মনে মনে খুব করে চেয়েছিল পরীক্ষা বন্ধ করতে, সেই জন্যই বাঘটা এসে সাহায্য করে গেল তাকে।

এমন কী, সেবার ইংলিশ গ্রামার অ্যাণ্ড কম্পোজিশানে থার্ড হয়ে গেল রুপালি। আগে কোনোদিন সে এত ভাল নম্বর পায়নি। যে দু-জন সেকেণ্ড আর ফার্স্ট হয়েছে, তাদের ইচ্ছেশক্তি বোধহয় আরও বেশি ছিল। তাতে দুঃখ নেই রুপালিরও, ওরা দু-জন ইচ্ছেশক্তিতে বাঘ ডেকে আনতে পারে না!

ছোটমাসির মেয়েরা

কলকাতা শহরে বাঘ, ভাল্লুক কিংবা গণ্ডার নেই বটে, তবে কিনা চোর ডাকাত আর ছেলেধরা সবসময় গিসগিস করছে। আমার ছোটমাসির কাছে তাই এই শহরটাও গভীর জঙ্গলের মতন। সব সময় সাবধানে থাকতে হবে।

ছোটমাসির দুই মেয়ে, রুমু ঝুমু। ওদের আরও দুটো বেশ ভাল নাম আছে বটে, কিন্তু সে-দুটো বেশ শক্ত, রুমু ঝুমু নামেই সবাই চেনে। ছোটমাসি তাদের এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করেন না নেহাত ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া। তাও ছোটমাসি ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দেন দুপুরে টিফিনের সময় যান, আবার বিকেলে যান নিয়ে আসতে। রুমু আর ঝুমু পড়ে ক্লাস এইট আর নাইনে। ওরা বেশ বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপায়ই নেই, ছোটমাসি সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে চান যে!

আমি একদিন বলেছিলাম, "এই তো বাড়ির কাছেই স্কুল, ওরা তো হেঁটেই চলে আসতে পারে, কত ছেলেমেয়ে আসে।"

ছোটমাসি চোখ গোল-গোল করে বললেন, "আর যদি ছেলেধরা ওদের ধরে নিয়ে যায়? ও পাশের পার্কটায় কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার লোক বসে থাকে, দেখলেই আমার কী রকম যেন সন্দেহ হয়!"

আমি বললাম, "ছেলেধরা ওদের ধরবে কেন? ওরা তো ছেলে নয়।"

ছোটমাসি তখন এক ধমক দিলেন, "তুই চুপ কর। কিছু বুঝিস না।"

টিফিনের সময় গিয়ে ছোটমাসি কড়া নজর রাখেন ওরা যাতে কোনরকমে ফুচকা বা ঝালমুড়ি না খেয়ে ফেলে। রুমু-ঝুমুর ক্লাসের বন্ধুরা মনের সুখে আলুকাবলি আর ঘুগনি-চটপটি খায়,

কিন্তু ওদের সেদিকে যাবারই উপায় নেই। ছোটমাসীর চোখের সামনে বসে ওদের বাড়িতে-তৈরি খাবার খেতে হয়।

আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের ডালমুট, চানাচুর আর হজমি গুলি খাওয়াই। যদিও জানি, ধরা পড়ে গেলে ছোটমাসির হাতে আমাকেও বোধহয় মার খেতে হবে!

ছোটমাসির ধারণা, চোরডাকাতের মতন অসুখের জীবাণুরাও সব সময় আমাদের চারপাশে ওত পেতে আছে। কখন যে তারা মুখ নাক দিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। সেইজন্য বাইরের কোনো জিনিস খাওয়া ওঁর মেয়েদের একদম বারণ।

একদিন আমি ছোটমাসির বাড়ির রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। দেখি কী, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটমাসি ও কে?"

ছোটমাসি বললেন, "ও-ই তো আমাদের রান্নার ঠাকুর।"

"ওর মুখ বাঁধা কেন?"

"বাঃ মুখ বাঁধা থাকবে না? আমার রান্নাঘরে মুখ-খোলা কারুকে ঢুকতে দিই না। মনে কর, দুধ জ্বাল দিচ্ছে, কিংবা ঝোল রাঁধছে, এমন সময় আপন মনে কথা বলে ফেলল। আর কথা বললেই একটু থুতু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাহলে ওদের সেই থুতুমাখা জিনিষ আমরা খাব?"

"রান্না করতে করতে আপন মনে কথা বলবে কেন?"

"যদি বলে? হঠাৎ বলে ফেলতেও তো পারে!"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "আমরা কথা বলার সময় তো থুতু বেরোয় না।"

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, "একটু-একটু বেরোয়, চোখে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য-বইতে লেখা আছে।"

আর একদিন দেখেছিলাম ও বাড়ির বাজার করা। সব বাড়ির লোকেরা বাজারে যায় থলি নিয়ে। আর ছোটমাসির

চাকর যায় একটা বড় প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে সেটায় আবার জল ভরা থাকে। সেই বালতিতে করে আনা হয় জ্যান্ত মাছ। ছোটমাসি তখন দাঁড়িয়ে থাকেন দোতালার বারান্দায়। চাকর বালতি থেকে মাছটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তখন মাছটা যদি দু' তিনবার লাফায় তাহলে ছোটমাসি খুশি। আর যদি বেচারা মাছটা লাফাতে না পারে অমনি ছোটমাসি বলবেন, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়।

ছোটমাসিদের দুধ নেওয়া হয় বাড়ির সামনেরই একজন গোয়ালার কাছ থেকে। দুধ দোয়াবার সময় ছোটমাসি রোজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে এককোঁটাও জল মেশানো না হয়। এ-ব্যাপারে তিনি ঠাকুর-চাকরদেরও কিচ্ছু বিশ্বাস করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আর একটা কাণ্ড করেন। সেটা অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, তবে শুনেছি। দুধ দোয়াবার আগে নাকি ছোটমাসি রোজ সেই গরুকে দশখানা জেলুসিল ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাইয়ে দেন। গরুর যদি অম্বল হয়, তাহলে সেই দুধ খেয়ে ওঁর মেয়েদেরও অম্বল হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটে তো অনেক নোংরা থাকে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গন্ধও নাকে ঢুকে যায়। রাস্তায় বেরুলে নিশ্বাস তো নিতেই হবে! সেইজন্য ছোটমাসি মেয়েদের নাকেরও ব্যায়াম করান।

প্রত্যেক শনি-রবিবার ছোটমাসি দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যান ঠাকুরপুকুর। সেখানে ওঁদের আর-একটা চমৎকার বাড়ি আছে। সাদা রঙের তিনতলা বাড়ি, মস্তবড় বাগান, সবটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একদিকের দেওয়ালের পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। এখানে থাকেন ঝুমু-ঝুমুর দাদু আর দিদিমা।

এখানে ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে আসেন টাটকা হাওয়া খাওয়াতে। এখানে ধুলোবালি নেই, কাছাকাছি কোনো

কলকারখানা নেই, বলে বাতাসে ধোঁয়া নেই, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমাসি রুমু-ঝুমুকে নিয়ে চলে আসেন সেই বাড়ির ছাদে। তারপর তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেন, "নিশ্বাস নে! ভাল করে নিশ্বাস নে!"

ঠিক ড্রিল মাস্টারের মতন ছোটমাসি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, "নিশ্বাস নে, এবার ছাড়, ছাড়। আবার নে!"

খানিকক্ষণ এরকম করার পর ছোটমাসি বলেন, "এবার হাঁ করে খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফ্যাল! এরকম টাটকা হাওয়া তো কলকাতায় পাবি না!"

রুমু-ঝুমু মায়ের সব কথা শুনে যায় লক্ষ্মী মেয়ের মতন। ওরা বুঝে গেছে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ছোটমাসির মনটা বড্ড নরম, কেউ ওর কথায় কোনদিন প্রতিবাদ করলেই উনি অমনি কেঁদে ফেলেন!

এত সব করেও রুমু-ঝুমুর চেহারা বেশ সুন্দর হয়েছে, পড়া-শুনাতেও ওরা ভাল। ছোটমাসির বাড়াবাড়ি দেখে আমরা মাঝে-মাঝে হাসাহাসি করি বটে. তাতে কিন্তু ছোটমাসি চটে যান না। নিজেও হেসে ফেলে বলেন, "তবুও ছাখ না, এত সাবধানে থেকেও কি সবসময় ভাল জিনিষ পাওয়ার উপায় আছে? সেদিন ওদের খাওয়ার জন্য বেছে বেছে ছোলা ভিজিয়ে দিলুম, তারপর ম্যাগনি-ফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখি কী, একটা ছোলা পোকায় ফুটো করা!"

একদিন আমি ছোটমাসিদের বাড়িতে তুপুরে বেড়াতে গেছি। ছোটমাসি তখন স্নান করেছিলেন। বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ তুটি কপালে উঠে গেছে, মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন

আমিও ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল?"

ছোটমাসী বললেন, "হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আর তারপরই যা বুকটা কাঁপতে লাগল..."

"কী কথা ?"

"তুই জানিস, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল ?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এটা আবার একটা নতুন কথা নাকি ? এতে ভয় পাবারই বা কী আছে।

আমি বললাম, "তাতে কী হয়েছে ?"

ছোটমাসি বললেন, "পৃথিবীর তিনভাগ জল এটা আগে খেয়াল করিনি ! তার মানে আমার মেয়েরা তো কখনো-না-কখনো জলের ধারে যাবেই। এদিকে আমি ওদের সাঁতার শেখাইনি। ওরা ডুবে যাবে যে। কালই যদি ডুবে যায় ?"

আমি হাসতে লাগলাম।

ছোটমাসি বললেন, "ধর, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল হল। তারপর বিলেত-আমেরিকায় গেল..."

আমি বললাম, "তা তো যেতেই পারে।"

"তখন সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে..মনে কর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে, হঠাৎ প্লেনটা ভেঙে গেল আর ওরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে তখন যদি সাঁতার না জানে, উরিব্‌বাবাঃ কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হবে।"

"বালাই ষাট, ওদের প্লেন কেন ভাঙবে। তবে যদি প্লেন ভেঙেই যায়, তখন অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়লে..."

"প্যারাসুট থাকবে তো। প্লেনে প্যারাসুট থাকে না। প্যারাসুটে করে জলে নামবে, তারপর তো সাঁতার জানতে হবে।"

আমি কল্পনা করতে লাগলুম প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে আমাদের রুমু আর ঝুমু নামছে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারপর জলপরীদের মতন সাঁতার কাটতে লাগল।

"যদি জাহাজে করে যায়, জাহাজও তো ফুটো হয়ে যেতে পারে।"

"তা তো বটেই।"

"পরশু থেকে ওদের গরমের ছুটি। পরশু থেকেই আমি ওদের সাঁতার শেখাব।"

"ঠিক আছে আমিই সাঁতার শিখিয়ে দেব ওদের।"

তুই সাঁতার শেখাবি। কোথায়?"

"কেন, গঙ্গায়।"

"গঙ্গায়? সাঁতার না শিখেই কেউ গঙ্গায় নামে। রোজ কত লোক ডুবে যায়।"

"তা হলে বালিগঞ্জের লেকে।"

"ধ্যুৎ ওখানে একগাদা লোক সাঁতার কাটে। কত রকম নোংরা থাকে জলে...।"

ছোটমাসি উঠে পড়ে লেগে গেলেন তাঁর তুই মেয়ের সাঁতার শেখবার ব্যবস্থা করতে। যে-কোন জায়গায় তো ছোটমাসি মেয়েদের সাঁতার শেখাতে রাজি হতে পারেন না। একদম পরিষ্কার জল চাই, সেই জলে আমার ওষুধ ফেলতে হবে। তার আগে মেয়েদেরও নিতে হবে নানারকম ইঞ্জেকশান।

ছোটমাসির নানান জায়গায় চেনাশুনো। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা করে ফেললেন কলকাতার খুব বড় একটা ক্লাবের সুইমিং পুলে। তা অন্য সকলের সঙ্গে নয়। খুব ভোরবেলা যখন কেউ যায় না, সেই সময় আগের দিনের জলের বদলে নতুন জল ভরা হবে, তাতে মেশাবেন ছোটমাসি তাঁর নিজস্ব ওষুধ। এবং সাঁতার শেখাবার জন্য ছোটমাসি ঠিক করলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ছোটমাসির ধারণা, যারা ইংরিজি বলে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ঝুমু-ঝুমু এর আগে কখনো মায়ের কথায় অবাধ্য না হলেও সাঁতার শিখতে রাজি হল না। তুজনেই বলল, জলে নামতে ওদের ভয় করে।

এদিকে ছোটমাসি একটা জিনিস ধরলে কিছুতেই সেটা মাঝপথে ছাড়েন না। ওদের কত করে বোঝালেন। গায়ে

মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এত ভয় কিসের। দেখবি একদিন-দুদিন নামলেই ভয় কেটে যাবে। ভাল ট্রেনার থাকবে। দরকার হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

মেয়েরা তবু শুনতে চায় না। কাচুমাচু মুখ করে বলতে লাগল, "এ বছর না, পরের বছর!"

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, এখন মেয়েরা রাজি না হলে কি চলে। কত কষ্ট করে ছোটমাসি সেই ক্লাবের লোকদের রাজি করিয়েছেন আলাদা ব্যবস্থা করবার জন্য। সুতরাং ছোটমাসি কাঁদতে শুরু করলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, "আমি তোদের ভালর জন্য এত সব করি। আর তোরা আমার কথা শুনবি না। সাঁতার না শিখলে কবে হঠাৎ ডুবে যাবি, পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল!"

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রুমু-ঝুমুকে রাজি হতেই হল।

যেদিন প্রথম সাঁতার শিখতে যাওয়া হবে সেদিন আমিও ভোরবেলা গিয়ে হাজির হলাম। ওদের উৎসাহ দিতে হবে তো। রুমু-ঝুমুর মুখচোখে খুব ভয়-ভয় ভাব। তখনও বলছে "মা, আজ না গেলে হয় না। বড্ড ভয় করছে।"

ছোটমাসি খুব নরম গলায় বললেন, "দেখিস, কোনো ভয় নেই। আমি তো পাশেই থাকব।"

সেই ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে রুমু আর ঝুমু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। ওদের ট্রেনার মেয়েটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক। আমরা আরও বেশি অবাক। ভয়ের চোটে রুমু-ঝুমুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

ছোটমাসি বললেন, "ওমা, তোরা ওরকম করছিস কেন? ভয় নেই। ভয় নেই!"

ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ছোটমাসি বললেন, "থাক, থাক, ভয় পাচ্ছে। ওদের নামতে হবে না!"

রুমু আর ঝুমু অমনি লাফিয়ে পড়ল জলে। ছোটমাসি আঁতকে উঠলেন যেন।

তারপরই দেখলাম একটা মজার দৃশ্য। ট্রেনার মেয়েটি ওদের দু'জনকে ধরতে আসতেই ওর পাশ কাটিয়ে ঝপাস ঝপাস করে সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল। খুব পাকা সাঁতারুর মতন।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিও হেসে উঠল। ছোটমাসি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? মেয়েটি হাসছে কেন?"

আমি বললাম, "ওর বোধহয় খুব হাসিখুশি স্বভাব!"

তারপর ছোটমাসি বললেন, "ওরা অতদূর চলে গেল কী করে? সাঁতার না জেনেও সাঁতার কাটছে?"

আমি বললাম, "তোমরাই মেয়ে তো। তুমি খুব ভাল সাঁতার জানো তাই ওদের আর শেখার দরকার হয়নি!"

রুমু-ঝুমু এই সময় টুপ করে ডুবে গেল। আর ওঠেই না, ওঠেই না। তখন ছোটমাসি খুব ভয় পেয়ে নিজেই শাড়ি-টাড়ি পরা অবস্থায় জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁর হাত টেনে ধরলাম। রুমু-ঝুমু ডুবসাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভুশ্ করে আবার মাথা তুলল।

এবার ছোটমাসি বুঝলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা ওরা সাঁতার জানে? এই তোরা কোথায় সাঁতার শিখলি? কবে শিখলি?"

রুমু-ঝুমু চিত-সাঁতার কাটতে কাটতে-কাটতে উত্তর দিল, "ঠাকুরপুকুরে।"

ছোটমাসি আরও অবাক হয়ে বললেন, "ঠাকুরপুকুরে ওরা কোথায় সাঁতার শিখল?"

আমি বললাম, "ঠাকুরপুকুর নাম যখন, নিশ্চয়ই সেখানে অনেক পুকুর আছে।"

ছোটমাসি বললেন, "পুকুর কোথায়? আমাদের ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে একটা নোংরা ডোবা আছে। সেটা তো পানায় ভরা, কেউ নামে না।"

রুমু-ঝুমু বলল, "আমরা সেটাতেই সাঁতার শিখেছি।"

"কে শেখাল?"

"কেউ শেখায়নি। নিজে-নিজে।"

ছোটমাসি ধপাস করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বললেন, "হায়, হায়, কী হবে? একা—একা সাঁতার শেখা কী সাজ্ঘাতিক কথা! আর ঐ বিচ্ছিরি নোংরা পুকুর, কতকাল ওর জল পরিষ্কার করা হয় না, সেটাতে নেমেছে আমার মেয়েরা। ওরা বেঁচে আছে, কী করে? হ্যাঁরে নীলু, কী হল বল তো।"

আমি বললাম, "সত্যিই তো, ওরা বেঁচে আছে কী করে! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!"

রুমু-ঝুমু তখন মনের আনন্দে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে!

রাজপুত্তুরের অসুখ

যখন যা চাই, তক্ষুনি সেটা এসে পড়বে, কোনো কিছুরই অভাব নেই। তবু মলয়কুমারের মুখে হাসি নেই। যখন-তখন সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। দিন-দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। মহারাজার একমাত্র ছেলে এই রাজকুমার মলয়ের খুব অসুখ।

আজকালকার দিনে তো আর আমাদের দেশে একটাও রাজা-মহারাজা নেই। তাই মলয়কুমার সত্যিকারের রাজকুমারও নয়। কিন্তু মলয়ের বাবা পাঁচটা খুব বড় কারখানার মালিক। তিনি থাকেন রাজা-মহারাজাদের স্টাইলে। তাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিল রাজপুতানা থেকে, কিন্তু এখন সবাই বাঙালী হয়ে গেছে। নিউ আলিপুরে ওঁদের বাড়িটা যে-কোনো রাজবাড়ির চেয়েও বড়। এ-বাড়ির হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া না থাকলেও গ্যারাজে আছে দশখানা মোটরগাড়ি আর বাড়ি ভর্তি দাসদাসী।

মলয়কুমারের জন্যই তিনজন চাকর, একজন ঝি, একজন গয়লা আর একজন ড্রাইভার।

মলয় ইচ্ছে করলেই যত খুশি চকলেট-লজেন্স খেতে পারে। কিংবা আইসক্রীম। কিংবা চাইনীজ খাবার। কিংবা সন্দেশ-রসগোল্লা। সে মুখের কথাটি খসালেই সব এসে যাবে। কিন্তু মলয় কিছুই খেতে চায় না। তার বয়েস এখন চোদ্দ বছর, রোগা, শুকনো চেহারা। কোনো খাবার তার সামনে আনলেই সে নাক কুঁচকে নাকি গলায় বলে, "না, কিঁচ্ছু খাঁব না, সঁব কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও।"

কত বড় বড় ডাক্তার আসেন। লম্বা-লম্বা কাগজে কতরকম ওষুধের নাম লিখে দিয়ে যান। কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আবার নতুন ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি এসে আগের ডাক্তারের সব

ওষুধের নাম কেটে দিয়ে আবার নতুন ওষুধ লিখে দেন। মলয়কুমার তবু খাবার দেখলেই বলে, "কুঁকুরকে খাঁইয়ে দাঁও!"

তার কুকুরটা ইয়া মোটা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর মলয়-কুমার আরও শুকিয়ে-শুকিয়ে একেবারে খ্যাংরা কাঠি হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার গরুর দুধে ভেজাল থাকে বলে মলয়ের জন্যে আলাদা গরু কেনা হয়েছে। ওদের নিজস্ব গয়লা মলয়ের মায়ের সামনে সেই দুধ দোয়। কোনো রকমে ভেজাল দেবার উপায় নেই। তবু একদিন মলয় সেই দুধে চুমুক দিয়ে বলল, "ইঁ, পঁচা গঁন্ধ!"

তারপর থেকে আর সে দুধ খায় না। মলয়ের মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বাড়িতে পোষা গরুর দুধও যদি ছেলে না খায় তা হলে আর এর চেয়ে ভাল দুধ কোথায় পাওয়া যাবে ছেলে যদি দুধও না খায়, তা হলে বাঁচবে কী করে? মলয়ের মা কান্নাকাটি করে হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিলেন বাড়িতে। তিনি বলতে লাগলেন, ছেলে না খেলে তিনিও আর কিছু খাবেন না।

মলয়ের বাবা কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাই থেকে দশজন বড় বড় ডাক্তার আনিয়ে এক মিটিং বসিয়ে দিলেন বাড়িতে। তার একমাত্র ছেলে, একে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে লাভ হল এই যে ডাক্তারদের মধ্যেই একটা ঝগড়া বেধে গেল। প্রায় প্রত্যেকে বললেন আলাদা-আলাদা রোগের নাম, খেতে বললেন নতুন-নতুন ওষুধ।

খালি দুজন ডাক্তার বললেন, মলয়ের কোনো অসুখই নেই সব সময় ভাল-ভাল খাবার খেয়ে খেয়ে ওর হয়েছে অরুচি সেই দুজনের মধ্যে একজন বললেন, ওকে আর কিছু খাবার দেবার দরকার নেই। দুদিন উপোসে রাখলেই ছেলে গপাগপ করে সব কিছু খাবে। আর একজন ডাক্তার বললেন, অত কিছু করারও দরকার নেই। না খেতে চাইলেই ওকে দুটো কা

থাপ্পড় মারতে হবে। দশবারোটা থাপ্পড় খেলেই ওর সব রোগ সেরে যাবে।

মলয়ের বাবা সেই দুজন ডাক্তারের দিকে কটমট করে তাকালেন। আর তাঁদের বিদায় করে দিলেন তক্ষুনি। বাকি আটজন ডাক্তারের আট রকম ওষুধেও কোনো উপকার হল না। মলয় সেইসব ওষুধও কুকুরকে খাইয়ে দিতে বলল।

তারপর হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, সাধুবাবার ওষুধ, ফকিরের তাবিজ অনেক কিছু দিয়েই চেষ্টা করা হল। কিছুতেই কিছু হয় না। মলয় এখন শয্যাশায়ী। আর বেশী দিন বোধহয় সে বাঁচবে না।

তখন বাড়ির একজন চাকর মলয়ের মাকে বলল, 'মা, বৌবাজারে এক জ্যোতিষী আছেন, তাঁকে এনে দেখাবেন। তিনি আবার কবিরাজি চিকিৎসাও করেন। ওনার চিকিৎসায় মরা মানুষও উঠে বসে।"

মলয়ের মা বললেন, "ডাক্, ডাক্ শিগগির সেই জ্যোতিষীকে ডাক্।"

সন্ধ্যেবেলা সেই জ্যোতিষী এসে হাজির। তার নাম মাধব পণ্ডিত। তার চেহারা দেখলে কিন্তু ভক্তি হয় না একটুও। পাগলা-পাগলা চেহারা, খালি পা, গায়ে গেঞ্জির ওপর একটা চাদর জড়ানো মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটো গাঁজাখোরদের মতন লাল। সে এল ও-বাড়ির চাকর গয়ারামের কাঁধে হাত দিয়ে।

বাড়তে ঢুকেই সে বলল, বাপরে বাপ, কত কত বাড়ি। দেখলেই ভয় করে। নিশ্চয়ই এ বাড়িতে অনেক কুকুর আছে।"

এ বাড়িতে সব মিলিয়ে পাঁচটা কুকুর আছে সত্যি। বাঘের মতন চেহারা।

মাধব পণ্ডিত বলল, "আগে সব কুকুর বাঁধো!"

মলয়ের বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ আবার কী চিকিৎসা করবে।"

মলয়ের মা বললেন, "দেখাই যাক না ও কী বলে। কুকুরগুলো বাঁধতে বলো ?"

মাধব পণ্ডিত মলয়ের ঘরে ঢুকেই বলল, "টক টক গন্ধ।"

মলয় চোখ বুজে শুয়ে ছিল, চোখ খুলল না।

মাধব পণ্ডিত বলল, "সব পচা খাবার !"

মলয় এবার চেয়ে দেখল মাধব পণ্ডিতকে।

মাধব পণ্ডিত বলল, "এ সব পচা খাবার কি রাজপুত্তুর খেতে পারে। ওর দোষ কী।"

মলয়ের বাবা বললেন, "পচা খাবার মানে? কলকাতার সবচেয়ে বড় দোকানের সবচেয়ে ভাল খাবার দেওয়া হয় ওকে।"

মাধব পণ্ডিত বলল, "হোটেলের খাবার, দোকানের খাবার তো। ওসব আমি জানি। ছেলেকে খাঁটি টাটকা খাবার দিন। ছেলে ঠিক খাবে।"

মলয়ের মা বললেন, "বাড়ির পোষা গরুর দুধ, সেটাও টাটকা নয়। এর থেকে টাটকা দুধ আর হয়।

মাধব পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল, "কোথাকার গরু।"

"মূলতানের গরু !"

"তাই বলুন ! যাদের বয়স ষোল বছরের কম, তাদের কক্ষনো মুলতানী গাইয়ের দুধ সহ্য হয় না। ভাগলপুরী গরুর দুধ সবচেয়ে ভাল।"

মলয়ের বাবা বললেন, "ঠিক আছে, কালই ভাগলপুর থেকে গরু কিনে আনাচ্ছি।"

মাধব পণ্ডিত বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। ভাগলপুরের গরু কলকাতায় এসে খাবে কী ? সেই তো শুকনো খড় ? তাতে আবার পচা দুধ দেবে। ভাগলপুরের ঘাস খাওয়াতে হবে। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা শিশির পড়ে থাকে যে ঘাসে, সেই ঘাস খাওয়াতে হবে গরুকে। তাহলে সেই গরু টাটকা দুধ দেবে।"

"ভাগলপুরের ঘাস এখানে কী করে পাব ?"

"এখানে পাবেন না। ভাগলপুরে পাবেন।"

"ঠিক আছে। ভাগলপুরে একটা বাড়ি কিনছি, মলয় গিয়ে কিছুদিন ওখানে থাকুক !"

দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। সেই দুধ খেয়ে হজম করতে হবে তো ! আপনার ছেলের হয়েছে বদহজমের অসুখ, এখন ভাগলপুরের জল তো ওর সহ্য হবে না ! ওর জন্য এখন লাগবে দেওঘরের দুধকুণ্ডের জল।"

"তা হলে দেওঘরে একটা বাড়ি কিনি, সেখানে গিয়ে থাকুক কিছুদিন।"

"দেওঘরে থেকে ভাগলপুরের গরুর দুধ খাবে কী করে ?"

"রোজ আনিয়ে নেব ওখান থেকে। তা হলে ছেলে ঠিক সারবে তো।"

"ছেলে কি শুধু জল আর দুধ খেয়ে বাঁচবে ? ভাত খেতে হবে না ? শাক তরকারি, মাছ মাংস খেতে হবে না। ও ছেলের কপালে কী লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন ?"

"কপালে আবার কী লেখা আছে। থাকলেও তা দেখা যায় নাকি।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি। ওর কপালে লেখা আছে লালগোলা"।

"লালগোলা।"

"হ্যাঁ, লালগোলা ! লালগোলা একটা জায়গার নাম।"

"তা তো জানি। কিন্তু একটা জায়গার নাম ওর কপালে লেখা থাকবে কেন।"

"আগের জন্মে ও জন্মেছিল লালগোলায়। ওর ষোল বছর বয়েস না হওয়া পর্যন্ত ওকে লালগোলার রূপশালি ধানের ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত খাওয়াতে হবে।"

"ঠিক আছে, সেই চালই আনাব।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত সহজ নয়। বলেছি না, টাটকা জিনিস চাই। প্রত্যেকদিন এককৌটো ধান ঢেঁকিতে ছাঁটিয়ে সেই চালের ভাত খাওয়াতে হবে। আগের দিনের চালের ভাত খাওয়ালে কোনো লাভ নেই।"

"বাবাঃ! তা হলে তো লালগোলায় গিয়ে থাকতে হয়। সেখানে একটা বাড়ি কিনব।"

"কিন্তু লালগোলায় গিয়ে থাকলে দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের টাটকা দুধ খাবে কী করে।"

তাও তো বটে!'

"আরও আছে! হজমের অসুখের পক্ষে খুব ভাল হচ্ছে পেঁপে সেদ্ধ। ঐ পেঁপে সেদ্ধ খাইয়ে আমি কত রুগীকে ভাল করেছি। কোথাকার পেঁপে বিখ্যাত জানেন। পুরুলিয়া। পুরুলিয়া থেকে প্রত্যেকদিন একটা করে গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা টাটকা পেঁপে যদি খাওয়াতে পারেন ..."

মলয়ের বাবা রেগে গিয়ে বললেন, অসম্ভব! যত সব বুজরুকি! পুরুলিয়ার পেঁপে লালগোলার চাল, দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ—প্রত্যেকদিন এগুলো এনে খাওয়ানো যায়। এত বাড়ির ছেলেরা সাধারণ খাওয়া খেয়ে ঠিকঠাক থাকছে......

মাধব পণ্ডিত বলল, 'এত বাড়ির ছেলের সঙ্গে আপনার ছেলের তুলনা। ও তো সাধারণ ছেলে নয়। চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি ক্ষণজন্মা। কবে যে মায়া কাটিয়ে চলে যাবে।

মলয়ের মা প্রায় কেঁদে উঠে বললেন, "অঁা! ছেড়ে চলে যাবে! ওগো, তুমি যেমন করে পারো, ওগুলো জোগাড় করো!'

মলয়ের বাবা বললেন, "এ কি সম্ভব নাকি? চারটে জায়গা চার দিকে। কী করে রোজ এসব জোগাড় হবে।"

তখন মলয় হঠাৎ বলে উঠল, "আমি পুরুলিয়ার পেঁপে খাব!"

সবাই চমকে উঠল সেই কথা শুনে। অনেকদিন বাদে মলয় এই প্রথম একটা কিছু খেতে চাইল নিজের মুখে!

মলয়ের মা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমাকে পুরুলিয়ার পেঁপে এনে দেব। আজই এনে দেব।"

মলয় বলল, "আমি লালগোলার চাল খাব।"

মলয়ের মা বললেন, "হ্যাঁ, তাই এনে দেব।"

মলয় আবার বলল, "আমি দেওঘরের জল আর ভাগলপুরের দুধ খাব! সব এক সঙ্গে!"

এই বলে মলয় মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে ভেবেছে, এই বার তার বাবা জব্দ হবেন! সে যখন যা চেয়েছে, সবই এনে দিয়েছেন তার বাবা। কিন্তু এবার আর তিনি তা পারবেন না।

কিন্তু মলয়ের বাবা মাধব পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, এই সবই আমি যোগাড় করব। কিন্তু পণ্ডিত, এতেও যদি ছেলের অসুখ না সারে।"

মাধব পণ্ডিত বলল, "এরপরও যদি আপনার ছেলের রোগ না সেরে যায়, তাহলে আমার নাক-কান কেটে আমায় ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবেন। কিন্তু একদিন খাওয়ালে হবে না। রোজ খাওয়াতে হবে এরকম, ছ'মাস ধরে অন্তত একটানা।"

মলয়ের বাবা বললেন, "তাই হবে! এতেও যদি ছেলে না সারে, তাহলে তোমার গর্দান নেব আমি। রেলের চাকার নীচে তোমায় কাটা মুণ্ডু গড়াবে। আর যদি ভাল হয়ে যায়...তাহলে তোমায় কত দিতে হবে?"

মাধব পণ্ডিত চোখ বুজে জিভ কেটে বলল, "আমায় কিছু দিতে হবে না! আমি পয়সা-কড়ি ছুঁই না। লোকের চিকিৎসা করে যদি আমি টাকা নিতাম, তাহলে কি আর আমাকে খালি পায়ে হাঁটতে হয়? আমি শুধু পরের উপকার করি।"

যেন একটা খুব মজার কথা বলেছে, এই ভাবে মাধব পণ্ডিত নিজেই হেসে উঠল হো হো করে।

মলয়ের বাবা সেইদিনই সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। চারজন চাকরকে পাঠালেন চারদিকে। এখন ট্রেনে বাসে সব জায়গায় যাওয়ার অনেক সুবিধে আছে। চারজন চাকর চলে যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর পুরুলিয়া। সেখান থেকে তারা ভোরবেলা চাল, জল, দুধ আর পেঁপে নিয়ে ফিরে আসবে বিকেলের মধ্যে। জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে তারা আবার চলে যাবে তক্ষুনি। আবার পরের দিন আসবে। এই ভাবে চলবে। চারজন লোক নিয়ে এল চাল আর জল আর দুধ আর পেঁপে। সেগুলো নামিয়ে রেখে তারা আবার ছুটল স্টেশনে। সেই দুধ ফোটাবার পর মলয়ের মা বললেন, "এবার খাবি তো?" মলয়ের বাবা কোমরে হাত দিয়ে রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন। মলয় দুধের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, "আ, এই দুধটা পচা নয়।" তারপর দেওঘরের জলে এক চুমুক দিয়ে বলল, "আ, এই জলটা খাঁটি।" এরপর সে লালগোলার চালের ভাত আর পুরুলিয়ার পেঁপেসেদ্ধ খেল বেশ আরাম করে অনেকদিন পর।

দিনের পর দিন এই রকম চলতে লাগল। স্বাস্থ্য ফিরে গেল মলয়ের। এক সপ্তাহের মধ্যে সে শুরু করে দিল দৌড়ঝাঁপ। ওদের বাড়িতে সকলের মুখে হাসি ফুটল। শুধু মলয়ের পোষা কুকুরটা আর মলয়ের ফেলে দেওয়া ভাল-ভাল খাবার খেতে পায় বলে মাঝে মাঝে কুঁইকুঁই করে!

এরপর এই গল্পের শুধু আর-একটু বাকি আছে। সেটা অবশ্য মলয়দের বাড়ির কেউ জানে না। লেখকরা ডিটেকটিভদের মতন সব কিছু জেনে ফেলে কিনা, তাই ওটুকু আমিও জেনে ফেলেছি।

মলয়দের বাড়ি থেকে চারজন চাকর বেরিয়ে যায় স্টেশনের দিকে। তারা যাবে লালগোলা আর দেওঘর আর ভাগলপুর আর

পুরুলিয়া। স্টেশনের কাছাকাছি এসেই তারা সুট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পালিয়ে যায়। চারজনেই চলে আসে বৌবাজারে মাধব পণ্ডিতের আস্তানায়। সেখানে তারা খুব করে গাঁজা আর জিলিপি খায় আর ঘুমোয়। পরদিন একজন রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল ভরে নেয় কুঁজোয়। একজন ছানাপট্টির গয়লাদের কাছ থেকে কিনে নেয় এক কিলো দুধ, একজন বাজার থেকে কিনে নেয় সবচেয়ে শস্তা চাল, আর একজন কেনে একটা পেঁপে। তারপর সেইগুলো নিয়ে খুব ব্যস্ত ভাব করে চলে যায় বাড়ি। সেগুলো রেখেই তারা আবার দৌড়ায়। আবার এসে হাজির হয়ে যায় মাধব পণ্ডিতের আড্ডায়। ট্রেন ভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সায় খেয়ে তারা নিজেরা খুব আনন্দ করে।

কলকাতার আর সব ছেলেরা যে চাল আর দুধ আর জল আর পেঁপে খায়, সেগুলো খেয়েই কিন্তু এখন মলয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়ে গেছে। এখন সে ইস্কুলের টিমে দারুণ ক্রিকেট্ খেলে! আর বাড়ি ফিরেই বলে, "শিগগির খাবার দাও, দারুণ খিদে পেয়েছে!"

ভয়ের পুকুর

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্ত বড় পুকুর। পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবর খানা। তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে-বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে আমি ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিসে চলে যান, মা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছা করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশীক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপি চুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু'একবার। কিন্তু ঐ কবর-খানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশী গা ছম ছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বার খাঁ বলেছিল, ঐ কবর খানায় নাকি ভূত আছে। আমি এদিক ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বোঁটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, এক ছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকতো, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা দু'জনে মিলে ভূত

দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয় নি। একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট ইটের টুকরো বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়; কোথাও কোন লোকজন নেই, আমি শুধু একা।

এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদি কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের উপরে গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর থেকে আমি সব সময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর।

পুকুর ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরী, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গা-গুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বঁড়শী নেই, বঁড়শী দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি

না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরণের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ও-গুলোর নাম বেলে মাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুরুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেক খানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবলু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তাহলে আমায় কে ডাকলো? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তা হলে কে ডাকলো। খুব কাছ থেকে! মা-ই কি আমাকে ডেকে চট্ করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন।

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তাহলে আমায় ডাকলো কে? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি!

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতালায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই মাত্র পুকুর ঘাটে গিয়েছিলে?

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন। তুই বুঝি গিয়েছিলি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস।

—না, মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুর ঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?

—কেন, কী হয় তাতে?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই? আর কোনদিন যাবি না। তোর পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে!

—তা হলেও যাবি না! খবরদার।

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুর ধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কী সব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলো তো খোকাবাবু।

আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখে ছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরের ধারে কক্ষণো একলা যেওনা। যেতে নেই

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এই সব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে।

—পানিমুড়া কী

—পানিমুড়া জানো না। পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত।

—ধ্যাৎ। জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি।

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনো নি। এতো সবাই জানে। পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না। কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মুনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ।

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমীরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এই সব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এই সব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী।

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে; একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাদের তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে!

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো। মুনাব্বর, খাঁ দেখেছে।

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধ্যেবেলা! মুনাব্বর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বলো না।

ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? কিচ্ছু নেই! ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বললো, না, মেমসাব! আমি নিজের চক্ষে দেখেছি!

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিচ্ছু দেখতে পান নি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো।

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু' তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে। দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর? মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি, ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এখানে এলো কোথা থেকে। আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোন লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে

সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে? চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে। আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুণে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমীরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন। শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল। তখন দেখেছি, ওর চোখের ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনদিন দেখেনি।

তক্ষুনি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এমন সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা বলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার!

আমার একবার ইচ্ছে হলো, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবারে সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। 'এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু, বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম!

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে

সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশী জল ঢোকে নি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময় গিয়ে না পড়লে কি যে হতো, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কি করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সে কথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো, মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আবার সেই মা মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুর ঘাট থেকে।

আমি জলে পরার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এতদূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু তোকে

আমি একা একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি।

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বললো, হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়! আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি। তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

দুষ্টু

প্রথম যখন এলো এ বাড়িতে, তখন ওর মাত্র দেড় মাস বয়েস। ফুটফুটে চেহারা জুলজুলে চোখ। যখন এদিক ওদিক দৌড়োয়, তখন মনে হয় ঠিক একটা সাদা বল গড়ালো মাটির ওপর দিয়ে। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

পুপ্‌লুই ওর নাম রাখলো দুষ্টু। ও পুপ্‌লুর নিজস্ব কুকুর। পুপ্‌লুর বাবা তেমন ভালোবাসেন না কুকুর, তিনি প্রথমে আপত্তি করে-ছিলেন একটু। কিন্তু পুপ্‌লুর মায়ের ইচ্ছে, বাড়িতে একটা কুকুর থাকে। পুপ্‌লুর সঙ্গে খেলা করবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুষ্টু সকলের মন কেড়ে নিল। সব সময় পায়ে পায়ে ঘোরে আর ভুক ভুক করে ডাকে। কী মিষ্টি ওর ডাকটা। ছোট্ট ছোট্ট দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস করে কামড়ে দেয়, তাতে কিন্তু একটুও লাগে না।

তিন মাস বয়সের সময়ও দুষ্টু তেমন বড় হলো না। প্রায় একই রকম চেহারা। শুধু গলার আওয়াজটা একটু গম্ভীর হয়েছে। বারান্দায় কাক বসলেই সে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায়। কাক-গুলোও ভারি চালাক। তারা বারান্দায় এক পাশ থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পাশে বসে। কাকেরা দুষ্টুকে ভয় পায় না, তারা ওকে নিয়ে খেলা করে।

সকালবেলা পুপ্‌লু যখন ইস্কুলে যায়, সেই সময় দারুন ছটফট করে দুষ্টু। সে কিছুতেই থাকতে চায় না। সে বুঝতেই পারে না, পুপ্‌লু তাকে ছেড়ে একলা কোথায় চলে যাচ্ছে। তখন দুষ্টুকে জোর করে ধরে রাখতে হয়। এক একদিন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় অনেকটা।

সাড়ে তিনমাস বয়সের সময় দুষ্টু একদিন পালালো বাড়ি থেকে। পুপ্‌লু ইস্কুলে চলে গেছে, পুপ্‌লুর বাবা বেরিয়ে গেছেন অফিসে, মা

রান্নাঘরে ব্যস্ত। এই সময় বাড়ির ঠিকে ঝি সদর দরজা খোলা রেখেছিল, ডুষ্টু টুক করে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ খেয়ালই করে নি। পুপ্লু বারোটার সময় ডুষ্টুর খাবার দিতে গিয়ে ডুষ্টুকে খুঁজে পেলো না। রেফ্রিজারেটারের তলাটাই ডুষ্টুর লুকোবার প্রিয় জায়গা। সেখানে নেই, বারান্দায় নেই, ছাদে নেই। তা হলে কোথায় গেল?

পুপ্‌লুর মা ঠিকে ঝিকে বললেন, দেখে এসো তো, সিঁড়ির নীচে বসে আছে কি না?

সেখানেও নেই ডুষ্টু!

পুপ্লুর মা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর ঠিকে ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। একেবারে মোড়ে পানের দোকানের সামনে তিনি দেখলেন একটা ভিড় জমে আছে। কাছে এসে তিনি দেখতে পেলেন ডুষ্টুকে।

সারা গায়ে সাদা সাদা বড় বড় লোম, ছোট্ট খাট্টো কুকুর তবু তার কী তেজ! তিনটে রাস্তার কুকুর ঘিরে ধরেছে, তারই মাঝ-খানে লোম ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করে ভয় দেখাচ্ছে ডুষ্ট। লোকেরা মজা দেখছে।

পুপ্লুর মা এসে বললেন, এই ডুষ্টু!

রাস্তার লোকেরা বললো, এটা আপনাদের কুকুর? তাই বলুন। দেখেই মনে হয়েছিল এটা কারুর বাড়ির্ পোষা কুকুর।

পুপ্লুর মা হাত বাড়িয়ে ডুষ্টুকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। কিন্তু ডুষ্টুটা এমন পাজী, সে এক লাফ মেরে খানিকটা দূরে সরে গেল। তারপর দৌড়াতে লাগলো পাশের রাস্তা দিয়ে।

লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, ধর, ধর!

কিন্তু ডুষ্টু চলে যেতে লাগলো আরও দূরে। পুপ্লুর মা তো আর কুকুরের পেছনে পেছনে ছুটতে পারবেন না। তিনি কোন ভাবে

দাঁড়িয়ে পড়লেন এক জায়গায়। তুষ্টুটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে, যে কোনো সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত, পাড়ার দরজির দোকানের একটা ছেলে পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেললো তুষ্টুকে। তুষ্টু দু'তিনবার কামড়ে দিল তাকে, কিন্তু ছেলেটি ছাড়লো না।

পুপ্লুর মা ওকে কোলে তুলে নিলে বকুনি দিয়ে বললেন, দাঁড়া আজ তোকে এমন মারবো!

তুষ্টু যেন তখন আর কিছুই জানে না। আদুরে গলায় ডাকতে লাগলো, কুঁই, কুঁই।

সেদিন থেকে তুষ্টুর জন্য কেনা হলো বাক্‌লস আর চেন। মাঝে মাঝে তাকে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু বাঁধা থাকাটা সে পছন্দ করে না, চ্যাঁচায় অনবরত। সেই চ্যাঁচানি শুনে পুপ্লুর বাবা বিরক্ত হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেন তুষ্টুকে।

সাড়ে পাঁচ মাস বয়েসের সময় তুষ্টু হঠাৎ বড় হয়ে উঠলো। এখন তার সামনে কোনো খাবার দেখালে সে ভাল্লুকের মতন দু' পায়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। যখন তখন সিগারেটের প্যাকেট আর কাগজ মুখে নিয়ে নিয়ে পালায়। অনেক কথা বোঝে। কিন্তু বুঝেও শোনে না অনেক কথা। সবাই বলে তার তুষ্টু নামটা সার্থক।

বাইরের লোক এলেই তুষ্টু খুব জোরে জোরে ডেকে তেড়ে যায়। অনেকে ভয় পায়। পুপ্লুর মামাতো বোন টুয়া আর এ বাড়িতে আসতেই চায় না। পুপ্লুর বন্ধু রাজন বলে, আগে ভাই তোমার কুকুর বেঁধে রাখো, তারপর তোমার সঙ্গে খেলবো।

একদিন পুপ্লুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল তিনটে লম্বা দাগ। সেখান থেকে কত রক্ত বেরিয়ে জমে আছে।

পুপ্লুর মা আঁতকে উঠে বললেন, ওমা, পুপ্লু, তোর ঘাড়ের কাছে ওরকম ভাবে কাটলো কী করে?

পুপ্লুর বাবা বললেন, এ তো মনে হচ্ছে, তুষ্টু কামড়েছে!

পুপ্‌লু বললো না না, এমনি কেটে গেছে।

—এমনি এমনি ঘাড়ের কাছে কেটে যায়?

—হ্যাঁ, ছাদে খেলতে গিয়ে একটা তারের খোঁচা লেগেছিল।

পুপ্‌লুর বাবা আর মা দু'জনেই বুঝে গেলেন যে, ওটা আসলে দুষ্টুরই কামড়ানোর দাগ। পুপ্‌লু তার নিজের কুকুরের দোষ চাপা দিতে চাইছে।

পুপ্‌লুর ঘাড়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো ডেটল। আর খুব বকুনি দেওয়া হলো দুষ্টুকে। বকুনি খেয়েই সে রেফ্রিজারেটরের তলায় লুকিয়ে পড়লো।

এরপর একদিন সে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর বাবাকেই। দুষ্টু একটা মাংসের হাড় নিয়ে এসেছিল পড়বার ঘরে, পুপ্‌লুর বাবা সেটি সরিয়ে নিতে যেতেই দুষ্টু ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল তার পায়ে। রক্ত বেরোয় নি অবশ্য, কিন্তু পুপ্‌লুর বাবা রেগে গিয়ে একটা খবরের কাগজ পাকিয়ে খুব করে মারলেন তাকে। পুপ্‌লু ছুটে এসে বললো, বাবা, ওকে আর মেরো না, আর মেরো না। ও তো ছোট, তাই বোঝে না।

এবার সে কামড়ালো পুপ্‌লুর মাকে। তিনি ওকে চান করিয়ে দিচ্ছিলেন। সাদা সাদা লোমগুলো ময়লা হয়ে গেছে। সাবান মাখিয়ে দিলে চকচকে ঝকঝকে হয়ে যায়। সেই সাবান মাখাতে যেতেই সে খুব জোরে কামড়ে দিল পুপ্‌লুর মাকে। রক্ত বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিন বিকেলবেলা দুষ্টু যেই পুপ্‌লুর মায়ের সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, অমনি তিনি রাগ করে বললেন যা, তুই যা এখান থেকে। তোর সঙ্গে আর কথা বলবো না।

দুষ্টু অমনি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নানারকম খেলা দেখাতে লাগলো। সে এমন মজার ভঙ্গি করতে লাগলো যে দেখলে না হেসে পারা যায় না। পুপ্‌লুর মা বারবার বলতে লাগলেন যা

বেরিয়ে যা এ ঘর থেকে ঘর থেকে। সে কিছুতেই যাবে না।

পরদিনই সে কামড়ে দিল ডিমওয়ালাকে।

তারপর দিন নীচের তলার একটা বাচ্চা মেয়েকে।

তারও পরের দিন পিওনকে।

ছুষ্টুকে নিয়ে আর পারা যায় না। যে যখন তখন যাকে-তাকে তাড়া করে যায় কিংবা কামড়ায়। যদিও তাকে সব রকম ইঞ্জেকশন দেওয়া আছে, কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। আবার অন্য সময় সে এমন ভালো হয়ে থাকে। এমন সব মজার মজার খেলা করে যে তখন তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে খুব। কামড়ে দেওয়াটাও যেন তার খেলা। বিশেষত বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়ে এলে সে কামড়াতে যাবেই। পুপ্লুর বন্ধুদেরও সে তেড়ে যায়। সে চায়, পুপ্লু শুধু তার সঙ্গেই খেলা করবে। আর কারুর সঙ্গে নয়।

এরপর একদিন সে পাশের ফ্ল্যাটের দিদিমাকে কামড়ে দিতেই সবাই চটে গেল খুব। পুপ্লুর মা কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেউ এই কুকুরটা নেবে?

অনেকেই রাজি। একজন তো বললো, এমন সুন্দর কুকুরটা দিয়ে দেবেন? আমি এক্ষুনি নিতে রাজি আছি।

পুপ্লুর মা বললেন, নিয়ে যাও।

কিন্তু পুপ্লু তখন বাড়িতে! সে এসে এমন চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে আর দেওয়া গেল না।

পরদিন সে আবার পুপ্লুর মাকে কামড়ালো।

আর এ কুকুর রাখা যায় না। সেদিন সকালে পুপ্লু স্কুলে গেছে, সে সময় একজন চেনা লোক এলো। পুপ্লুর মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই কুকুরটা নেবে? সে তক্ষুনি রাজি। এত ভালো জাতের কুকুর কিনতে গেলে অনেক পয়সা লাগে। বিনা পয়সায় পেয়ে সে খুব খুশী।

সত্যিই সে তুষ্টুকে নিয়ে চলে গেল।

পুপ্‌লুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই তুষ্টু বসে থাকতো দরজার সামনে। পুপ্‌লু এলেই লাফিয়ে পড়ত তার গায়ে। তখন থেকেই শুরু হতো খেলা। সেদিন তুষ্টুকে না দেখে পুপলু বললো, মা তুষ্টু কোথায়?

মা বললেন, সে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে।

পুপ্‌লু বললো, না, হারিয়ে যায়নি। তোমরা নিশ্চয় কাউকে দিয়ে দিয়েছো। কেন দিয়েছো?

মা বললেন, ছাখ, আজ আমার হাতে আবার কতটা কামড়ে দিয়েছে।

পুপ্‌লু তবু মানলো না। সেদিন সে খেল না। খেলতে গেল না। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পুপ্‌লুর মায়েরও মনটা খারাপ হয়ে গেছে বেশ। এতদিন ধরে পুষলে মায়া পড়ে যায়। কত কথা মনে পড়ছে।

রাত্তিরবেলা অফিস থেকে ফিরে পুপ্‌লুর বাবা বললেন তুষ্টু কোথায়? তারপর নিজেই আবার বললেন, ও তাকে তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় খালি খালি লাগছে বাড়িটা।

মা বললেন, পুপ্‌লুর খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছু খেল না।

বাবা বললেন, আমারও তো মন খারাপ লাগছে।

মা বললেন, ফিরিয়ে আনবো নাকি? যে নিয়ে গেছে, সে যোধপুরে পার্কে থাকে। বাড়িটা চিনি না। বাবা বললেন থাক, আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে, এমন সময় খট্ খট্ করে দরজায় একটা শব্দ। এত রাত্রে কে এলো? দরজা খুলতেই তুষ্টু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর। ডাকতে লাগলো কুঁই কুঁই করে।

পুপ্লু পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে এসেছে। সবাই অবাক সঙ্গে আর কেউ নেই। অতদূর যোধপুর পার্ক থেকে তুষ্টু কী করে চলে এলো রাস্তা চিনে।

মা বললেন, তুষ্টু, তুই আবার এসেছিস?

তুষ্টু মায়ের ওপর গিয়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। যেন সে ক্ষমা চাইছে। পুপলু তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

আশ্চর্য, তারপর থেকে আর একদিন ও তুষ্টু কাউকে কখনো কামড়ায় নি।

দক্ষিণের ঘর

শিমূলতলায় অনেক বড় বড় বাড়ি ফাঁকা আছে। তার মধ্যে একটা বাড়ি হচ্ছে দীঘাপাতিয়ার রাজাদের। ঐ রাজার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে পুপ্‌লুর বাবার চেনা ছিল। তাই সেবারে পুপ্‌লুরা বেড়াতে গেল শিমূলতায়। রাজাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে উঠলো গিয়ে সেই বাড়িতে। একজন মালি থাকে সেখানে। সে একতলা দোতলার সবগুলো ঘর খুলে দিল। শুধু বললো, বাবু, একতলার দক্ষিণের ঘরটায় আপনারা যাবেন না। এ ঘরটা খারাপ।

প্রথমেই শুনে পুপ্‌লুর অবাক লেগেছিল। খারাপ মানে কী? ঘর আবার খারাপ হয় কী করে? মা-বাবা খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেন। কিন্তু খারাপ ঘর? একতলায় বিরাট উঠোন। সেই উঠোনের এক পাশে সেই ঘরখানা। ভাঙা-টাঙা নয়। মস্ত বড় লোহার দরজা। তাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড তালা।

দু' তিনদিন থাকবার পর শিমূলতলায় অনেক কিছু দেখা হয়ে গেল। লাট্টু পাহাড়ে পুপ্‌লু উঠেছিল তিনবার। কিন্তু পুপ্‌লুর সবচেয়ে বেশী ইচ্ছে করে ঐ দক্ষিণের ঘরটা দেখতে। একদিন সে মালিকে বললো, মালিদাদা, ঐ ঘরটা আমাকে একটু দেখতে দাও না!

মালি শিউরে উঠে বললো, ওরে বাবা! ও কথা বলতে নেই! ওটা খুব খারাপ ঘর। যে-ঢোকে, সে আর বেরোয় না।

পুপ্‌লু জিজ্ঞেস করলো, কেন? ও ঘরে কী আছে?

মালি বললো, ও বাবা? সে আমি বলতেই পারবো না?

একদিন দুপুরবেলা পুপ্‌লু চুপি চুপি গেল সেই ঘরটার কাছে। ঘরের জানালাগুলোও ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে কান দিয়ে রেখে তার মনে হলো, কেউ যেন সেই ঘরের মধ্যে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। পুপ্‌লু তালাটা ধরে কয়েকবার নাড়া-চাড়া করতেই ঘরের মধ্যেও যেন গুম্ গুম্ করে শব্দ হতে লাগলো! পুপ্‌লু খানিকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

বিকেলবেলা মাকে সে জিজ্ঞেস করলো, মা একতলার দক্ষিণের ঘরটা খোলা হয় না কেন?

মা বললো বোধ হয় ঐ ঘরে রাজাদের নিজেদের জিনিষপত্র আছে!

পুপ্লু বললো, তা হলে মালি কেন বললো, ওটা খারাপ ঘর?

মা বল্লো, মা, ঐ ঘরের মধ্যে কারা যেন আছে, ফোস্ ফোস্ করে নিশ্বাস ফেলে।

মা হেসে বললো, ধ্যুৎ! ওর মধ্যে কে থাকবে আবার। কতদিন ধরে ঐ ঘর তালাবন্ধ। ওখানে কি কেউ থাকতে পারে?

পরদিন পুপ্লু দুপুরবেলা আবার গেল সেখানে। দরজায় কান দিয়ে রইল। সেদিনেও মনে হলো, ভেতরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

সেদিন পুপ্লু ভয় পেল না। তার দারুণ কৌতূহল হলো সে ছুটে গিয়ে মালিকে বললো, মালিদাদা, ঐ ঘরে কে থাকে?

মালি বললো, ওরে বাবা, ওসব কথা বলতে নেই। ওদিকে যেও না খোকাবাবু। ঐ ঘরের মেঝেতে সুড়ঙ্গ আছে।

পুপ্লু বললো, তুমি তালাটা খুলে দাও না। আমি শুধু ভেতরটা একবার দেখবো।

মালি বললো, ওর চাবি তো আমার কাছে নেই। সে তো আছে রাজাদের কাছে। রাজারা তিন বছর আসেননি এখানে। কলকাতা থেকে জরুরি চিঠি পেয়ে এর দু'দিন পরেই পুপ্লুর বাবা কলকাতায় ফিরে এলেন সবাইকে নিয়ে।

এখন যদি কেউ পুপ্লুকে জিজ্ঞেস করে, শিমুলতলায় কেমন বেড়ালে পুপ্লু? সে চুপ করে থাকে। তার মন খারাপ লাগে। সেই দক্ষিণের ঘরটাই দেখা হলো না। কী আছে সেখানে? পুপ্লু কোনদিন কি জানতে পারবে না?

পাগলের মন্ত্র

গতবারে পুজোর ছুটিতে রাঁচীতে বেড়াতে গিয়েছিল পুপ্‌লু। সঙ্গে তার মা, ঠাম্মি কাকা, কাকীমা আরও অনেকে। খুব মজা, হৈ-চৈ হলো, পাহাড়ে চড়া হলো। কিন্তু ফেরার দিন হলো এক বিপদ। রাত্তিরবেলা ট্রেন, ওরা এসে স্টেশনে পৌঁছোবার ঠিক এক মিনিট আগে ছেড়ে চলে গেল ট্রেন। ওরা খুব চ্যাঁচামেচি করলো, পুপ্‌লু বললো, এই ট্রেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! কিন্তু ট্রেন আর শুনলো না ওদের কথা।

সেই রাত্রে ওদের আবার ফিরে আসতে হলো হোটেলে। কত রকম মুশকিল হলো। খুব রাগ হলো পুপ্‌লুর।

পরের রাত্রে আবার ট্রেন। পরের দিন সকালে সবাই ওদের দেখে অবাক। সবাই বললো, একি পুপ্‌লুবাবু, তোমরা যাও নি? এমা, তোমরা ট্রেন ধরতে পারলে না?

পুপ্‌লুর খুব লজ্জা করতে লাগলো।

ওদের হোটেলের সামনেই ছিল একজন পাগল। সে পুপ্‌লুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো, তারপর পুপ্‌লুর কানে কানে কী যেন বলে দিল খুব গম্ভীর ভাবে। পুপ্‌লুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

পাশের পানওয়ালা জিজ্ঞেস করলো, এই পাগলা, ওকে কী বললি রে?

পাগল বললো, ওকে এমন মন্তর শিখিয়ে দিলাম যে আর কোনোদিন কোনো ট্রেন ওকে ফেলে পালাতে পারবে না।

সেদিন রাত্তিরে ওরা সবাই ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হলো স্টেশনে। ট্রেনেও জায়গা পেয়ে গেল ঠিকঠাক। তারপর ট্রেন ছাড়লো, পুপ্‌লুও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন ভোরবেলা জেগে উঠে দেখলো, ট্রেন তখনো চলছে, কলকাতা অনেক দূরে। কী একটা ছোট স্টেশনে ট্রেনটা থামলো। পুপ্‌লু কারুকে কিছু না বলে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে। তার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। কাছেই একটা কল আছে, সে ভাবলো, এক ছুটে গিয়ে জল খেয়েই চলে আসবে।

পুপ্‌লু যেই জল খেতে এসেছে, অমনি চলতে শুরু করলো ট্রেনটা। এদিকে পুপ্‌লুর মা কিংবা কাকারা কেউ জানে না যে পুপ্‌লু নেই। পুপ্‌লু জল খাওয়া সেরে পেছন ফিরেই দেখে ট্রেনটা বেশ জোরে ছুটছে। সে কিন্তু ভয় পেল না, হাসলো। দু'হাত তুলে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো একটা মন্তর। ওমা, তাতেই ঠিক থেমে গেল ট্রেনটা। দু'বার কু কু করে সিটি দিয়ে ট্রেনটা থেমে পড়লো একটু দূরে।

পুপ্‌লু দৌড়ে এসে উঠে পড়লো নিজেদের কামরায়। ট্রেনের সিটি শুনে তার মা জেগে উঠেছিল। কামরায় আরও অনেকে উঠেছে, সবাই অবাক। ট্রেনটা কেন থামলো ?

পুপ্‌লু বললো, আমার জন্য। আমি যে ট্রেন থামাবার মন্ত্র জানি!

এর পরেও পুপ্‌লু বেশ কয়েকবার ট্রেন থামিয়ে দিয়েছে। কোনো ট্রেন তাকে ফেলে চলে যায় না। পুপ্‌লু কিন্তু সেই মন্তরটা আর কারুকে বলে না। পাগলের মন্ত্র নাকি সবাইকে বলতে নেই!